প্রকাশক
শ্রীক্ষীরোদলাল দত্ত
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ
নিউ সরস্বতী প্রেস
২৫/৩এ, শম্ভু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

পিতৃদেব
স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

সূচী

—*—

প্রকাশকের নিবেদন

'প্রবাসী'র অমর সম্পাদক, ঋষিকল্প রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'প্রবাসী' পত্রিকাকে একদিকে যেমন দেশসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন অন্যদিকে তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রচার তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই কার্য্যে তাঁর দুইটি কন্যা শ্রীমতী শান্তা দেবী ও শ্রীমতী সীতা দেবী তরুণ বয়স হইতেই পিতাকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। ছাত্রী অবস্থায় রচিত 'হিন্দুস্থানী উপকথা' ও 'উদ্যানলতা' এখনও জনচিত্ত আকর্ষণ করে। ছোট গল্প এবং উপন্যাস রচনায় শান্তাদেবী যে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা দেশে ও বিদেশে সুসাহিত্যিক মহলে স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার 'শিক্ষার পরীক্ষা' প্রভৃতি গল্প যখন 'Tales of Bengalএ Humphrey Milford কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় তখন বিলাতে সাহিত্যসেবীদের মুখপত্র Nation and the Athenaeum' এই মন্তব্য করেন :—

"In the first story 'The Ugly Bride' one discovers in Santa Devi, the ease, spontaneity and humour of our own practised lady novelists. There is a delicate bite of irony in it, and the pathos is unforced. Tara Sundari might have sat for Chaucer or Katherine Mansfield, an ancient universal type yet convincingly individual… …"

শান্তাদেবীর এই প্রসিদ্ধ গল্পটি ফরাসী ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। শান্তাদেবীর প্রথম ছোট গল্প 'ঊষসী' ও প্রথম উপন্যাস 'চিরন্তনী' ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবের গভীরতায় আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার পর 'জীবনদোলা', 'অলখঝোরা' প্রভৃতি কত উচ্চাঙ্গের রচনা বাঙালী পাঠক-পাঠিকাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহাদের প্রীতির উপর শান্তা দেবীর একটি নিজস্ব দাবী আছে।

তাই আমরা বিগত দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার যে গল্পগুলি রচিত হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া এই 'পথের দেখা' বইখানি বাঙালী সুসাহিত্যিক মহলে উপহার দিলাম।

শান্তা দেবীর অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ এবং চিত্তাকর্ষক ভ্রমণকাহিনীও 'প্রবাসী'তে ও অন্যান্য পত্রিকায় ছড়াইয়া আছে। সেই সব রচনার মধ্যে কিছু কিছু ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পথের দেখা

সংসারে প্রায় সব মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর পাগলামি দেখা যায়। একটা কিছু খেয়াল না হইলে যেন তাহারা বাঁচিতে পারে না। জগৎসুদ্ধ লোক কলের ছাঁচে ঢালা নকল শিল্প-সৃষ্টির মত যদি হুবহু একই ধরণে স্নান, আহার, উপার্জ্জন, অধ্যয়ন, আমোদ, বিলাস মাপিয়া যথাযথ ভাবে করিত, তবে জগতে বৈচিত্র্যের বালাই থাকিত না। সৃষ্টির একঘেয়ে রূপ দেখিয়া মানুষের চোখে জ্বালা ধরিয়া যাইত। তাই বিধাতা মানুষের মাথায় পাগলামির ছিট দিয়া তাহাদের সহস্র রূপ খুলিয়া ধরিলেন।

অনসূয়ার পাগলামি ছিল বিদ্যা। তিন বছর বয়স না হইতেই সে বই পড়িবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ দেড় বছর বয়সেই তাহার প্রিয় খেলনা ছিল প্রকৃতিবাদ অভিধান ও বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। কাঠের খেলনা, মাটির পুতুল কি টিনের বাঁশী ত তাহার পছন্দ হইতই না, বই খাতাও পাৎলা হাল্কা-রকমের হইলে সে ঠোঁট ফুলাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া অভিমান ভরে সব দূরে ঠেলিয়া দিত। যে-পুস্তকের ভারে তাহার শিশুদেহ টলমল না করিয়া উঠিত, দুই হাতে তেমনই গুরুভার কিছু আঁকড়াইয়া ধরিতে না পারিলে তাহার গর্ব্ব ক্ষুন্ন হইত, আনন্দ স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া পড়িত। কাজেই অনসূয়া যে সরস্বতীকে হার মানাইবার খেলায় ভবিষ্যতে মত্ত হইয়া উঠিবে ইহাতে

আর আশ্চর্য্য কি আছে? অল্প বয়সেই সে বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পিতামাতা বলিলেন, পড়াশুনা ত সাঙ্গ হ'ল, এইবার ঘর-সংসারের কাজে মন দাও, নিজের ঘর ত করতে হবে। অনসূয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে বলিল, "সে কি! বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কম করেও পনের ষোল বিষয়ে এম-এ পড়ান হয়, আমার ত এখনও একটাও পড়া হয় নি, এরি মধ্যে পড়াশুনা সাঙ্গ হল কি করে?"

অনসূয়া দর্শনশাস্ত্রে ডুব দিল; দুই বৎসর পরেই সে-সাগর পার হইয়া আসিয়া সে আবার ইতিহাসের বিপুল বোঝা লইয়া বসিল। বিশ্ববিদ্যালয় আবার আর-একটা খেতাব দিয়া অনসূয়াকে খুসী করিয়া দিলেন। অর্থনীতিতেও একটা ডিগ্রী লইয়া সে দেখিল এখনও আরও অনেক সাগর মন্থন করিয়া খেতাব আহরণ করা যায় বটে, কিন্তু এখানে একটা মস্ত বিপদ আছে। যত বিদ্যাই সে আয়ত্ত করুক না কেন, সবেরই সেই এক উপাধি এম্-এ! এক্ষেত্রে নূতনত্ব কিছু নাই। উপাধি-অর্জ্জনের ফাঁকে ফাঁকে অনসূয়া সঙ্গীত-চর্চ্চাও করিয়াছিল; কিন্তু বাংলা দেশে সঙ্গীতের কোনও খেতাব ছিল না, যশও তেমন কিছু নাই। সুতরাং নূতন আর-একটা অলঙ্কারে নামটা ভূষিত করিবার জন্য এবং সম্পূর্ণ অন্য ধরণের আর একটা বিদ্যা দখল করিবার জন্য সে ঠিক করিল ডাক্তারি পড়িবে। কলিকাতায় পড়িবার চেষ্টা করিল, সুবিধা হইল না। কিন্তু তাই বলিয়া অনসূয়া কি হাল ছাড়িবার মেয়ে? সে দিল্লী যাইবার সব ব্যবস্থা করিয়া বসিল। হইলই বা অজানা অচেনা দেশ! মানুষের দেশ ত! যেমন করিয়া হউক সেখান হইতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটা ডিগ্রী লইয়া আসিতে হইবে। অনসূয়া হিসাব করিয়া দেখিল ডিগ্রী লইবার পর তাহার যত

বয়স হইবে তাহাকে খুব একটা কিছু প্রবীণ-জনোচিত বয়স বলা চলে না। সুতরাং তাহার পর ইউরোপে গিয়া তৃতীয় আর একটা কিছু পথে ডিগ্রীর বহর আর কিছু বাড়াইয়া আনাও চলে। খুসী হইয়া অনসূয়া বাক্স পেঁটরা গুছাইতে বসিল, দিল্লী পৌঁছাইয়া দিবার সঙ্গীও ঠিক করিল। একেবারে একলা পথচলার অভ্যাস তাহার ছিল না; কারণ এই পথ-চলার বিদ্যাটাকে অনসূয়া দুর্লভ দুরধিগম্য মনে করিত না। তাই সেটা আয়ত্ত করা আর তাহার হইয়া উঠে নাই।

যাত্রার দিন কি-একটা পর্ব্ব উপলক্ষে ছুটি ছিল। ছুটির সুযোগে দেশে-বিদেশে ছুটিবার নেশায় কলিকাতা সহর চিরকালই অধীর হইয়া উঠে। সেদিনও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। অনসূয়া ষ্টেশনে নামিয়াই দেখিল তাহার মাথার উপর সহস্র ষ্টীল ট্রাঙ্কের তরঙ্গ বিপুল উল্লাসে দুলিয়া উঠিতেছে, আশেপাশে সপ্ত সহস্র রথী তাহাদের পুঁটুলি, ধামা, ধুচুনী, বস্তা ও কেনেস্তরার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহাকে ঘিরিয়াই যেন এক অভূতপূর্ব্ব ব্যূহ রচনা করিতেছে; পায়ে পায়ে কেবলই সাদা, কালো, শ্যাম ও গৌর সহস্র চরণ আসিয়া ঠেকিতেছে; বুটজুতা, শু্য-জুতার গুঁতায় তাহার সৌখীন মার্কিণ পাদুকা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিতেছিল; তাহার উপর আবার নাগরা ও নগ্নপায়ের ধূলা-কাদা ও পঙ্ক পড়িয়া তাহার শুচিবায়ুগ্রস্ত মন শুদ্ধ পঙ্কিল হইবার জোগাড়। প্লাটফরমের লৌহ-দরজা বন্ধ; যাত্রীদল তাহার কঠিন বুকে গিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহাকে টলাইতে পারিতেছে না। এখনও যে সময় হয় নাই; দয়া কি সুবিধার খাতিরে সময়ের বাঁধা-নিয়ম ত ভাঙা যায় না। জনারণ্য অধীর হইয়া কণ্ঠস্বরে ও বাহুর আস্ফালনে রুদ্ধ আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। ভীড়ের ভিতর নারী জাতির

সংখ্যা অতি সামান্য ; দুই চারিটি মেয়ে এদিকে ওদিকে ছড়াইয়াছিল, তাহারা ক্রমে সরিয়া সরিয়া অনসূয়ার পাশ ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। অশান্তির কল-কল্লোলের ভিতর সেইখানটুকুতে একটু শান্তির আভাস পাওয়া যাইতেছিল। ফিরিঙ্গি টিকিট-কালেক্টরের নজর পড়িল সেই দিকে। হঠাৎ তাহার মনটা নরম হইয়া উঠিল। সে বলিল, "মেয়েদের ভিতরে আসিতে বলুন।" লোহার দরজা একটুখানি ফাঁক করিয়া রাস্তা করিয়া দিতেই অনসূয়া ও অপর তিন চারিটি মেয়ে ভিতরে ঢুকিয়া আসিল ; তাহাদের সঙ্গী পুরুষদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হইল। 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা' বলিয়া যাহারা সঙ্গিনীহীন হইয়া যাত্রা করিয়াছিল তাহারা মধ্যপথে তেমনই আটক হইয়া পড়িয়া রহিল। ভীড়ের দিনে, সঙ্গিনীরা যে নিছক অসুবিধাই বাড়াইয়া তো'ল না, ইহা বুঝিয়া দু-দশজন মনে মনে নিজেদের কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গীদের উদ্যত ছাতা, হুঁকা, লোটা ও সোঁটার গুঁতায় তাহাদের মনে করুণ-রস বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। কোলাহল ও অধীরতা বাড়িয়াই চলিল।

লৌহ দরজার পারে লম্বা প্লাটফরমটায় এতক্ষণ জন-প্রাণী ছিল না। জনারণ্যের ধারের এই মরুভূমিটার জন্য তাই এতগুলি মানুষের মন এমন লালায়িত হইয়া উঠিতেছিল। খোলা জায়গা পাইয়া মেয়েরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু মানুষ যত পায় তত চায় ; যতক্ষণ দাঁড়াইবারও ঠাঁই ছিল না, ততক্ষণ বসিবার কথা কাহারও মনে আসে নাই ; এইবার বসিবার আসনের খোঁজ পড়িয়া গেল। মাত্র দুইটা বেঞ্চ ছিল প্লাটফরমে। মেয়েরা দেখিল তাহার দেড়খানাই তাহাদের পুরুষ-সঙ্গীরা দখল করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং তাহাদের বসিতে পাইবার আশা কম। বেঞ্চির ঠিক মাঝখানে একটা লোহার হাতল

আসনটাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখে। অনসূয়া দেখিল, এমনি আধখানা বেঞ্চি শূন্য পড়িয়া আছে। সে লুব্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাইল। দুইটি পুরুষ পাশেই বসিয়াছিল, অনসূয়ার দৃষ্টিতে আনন্দে পুলকিত হইয়া তাহারা আসনে আরও এলাইয়া পড়িল। মানুষ দুইটিকে ডাকিয়া বলিলেও যে তাহারা নড়িবে না এবং তাহারা থাকিলে অন্য মেয়েরা সে আসনে কখনই সহজে বসিবে না, ইহা বুঝিয়া অনসূয়া একলাই বাকি অর্দ্ধাসন দখল করিয়া বসিল। অন্য তিনটি মেয়ে কেহ মেঝের উপর উবু হইয়া, কেহ বা মোটের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। অনসূয়ার দুঃসাহস দেখিয়া স্ত্রীপুরুষ সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গীটি তখন প্লাটফরমের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারি করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার কবিতেছিলেন।

ঝুঁটি বাঁধা ছোট একটি মেয়ে হঠাৎ তাহার মাকে ঠেলা দিয়া বলিয়া উঠিল, "মা, দেখ দেখ, মেম মামা-বাবুর মত হাতে ঘড়ি বেঁধেছে। ওর ঘড়িটি কেমন রাঙা, নয় মা? মামা-বাবুরটা সাদা বিচ্ছিরি।" মা বলিল, "দূর পাগ্‌লি, ও মেম কেন হবে রে! ও যে বাঙ্গালী। সোনার ঘড়ি হাতে দিয়েছে, বড় লোকের মেয়ে হবে বোধ হয়। অমন চেঁচিয়ে কথা ক'স্‌নি, শুনলে কি ভাব্‌বে?"

মাতাপুত্রীর কথোপকথন অনসূয়ার কানে সবটাই আসিয়াছিল। সেও কৌতূহলী হইয়া তাহাদের দিকে তাকাইল। সবুজ-রঙের একটা নূতন টিনের বাক্সের উপর চাঁদনীর তৈয়ারী লালডোরা-কাটা ফ্রক গায়ে সাত-আট বৎসরের একটি শীর্ণ বালিকা মা'র মুখের উপর ঝুঁকিয়া

পড়িয়া বসিয়াছিল। তাহার পায়ে বার্ণিশকরা জুতার উপরেই ঝাঁঝ মল চড়ানো, মাথার উবু ঝুঁটির উপর হাড়ের ফরাসী শিরোভূষণ, ফ্রকের পিছনের হুক ছিঁড়িয়া পিঠের হাড় দেখা যাইতেছে। বালিকার লুব্ধ নয়ন অনসূয়ার সাজ-পোষাক যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। বালিকার মাতার মাথার কাঁচা-পাকা চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, পরনে সরু ফিতাপাড় আধময়লা ধুতি, গায়ে পাটকিলে রঙের অতি পুরু একটা পুরুষোচিত আলোয়ান। দেখিলে মনে হয় মেয়েটি তিন চার দিন অস্নাত-অভুক্ত ভাবে কেবল পথে পথেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কন্যার মত লুব্ধভাবে না হইলেও মাতাও যে অনসূয়াকে আপাদমস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল, তাহা সেদিকে চোখ ফিরাইলেই যে কেহ বুঝিতে পারে।

অনসূয়া সেদিকে চাহিতেই মাতা লজ্জিত ভাবে একবার মুখ নামাইয়া তাহার পরই মুখ তুলিয়া কথা জমাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" অনসূয়ারও গল্প করিবার সখ জাগিয়া উঠিল, সে বলিল, "যাচ্ছি অনেক দূর, দিল্লী; আপনি কখনও গিয়েছেন?" খুকীর মা বলিল, "না ভাই, ও সব হিল্লী-দিল্লী-যাওয়া কি আমাদের কপালে লেখে, না আমাদের হাড়ে পোষায়? তবে হ্যাঁ, আমাদের ভাইভাজ গেছ্‌ল বটে ও-দিকে। তারা ত সারা পিথিমিটাই ঘুরেছিল। সেই কোন্ নক্কা, ছিক্ষেত্তর, পৈরাগ, তারপর গে দার্জ্জিলিং পাহাড় আরো কত কি সব দেখেছে। এমন দেশটির নাম করতে পারবে না, যেখানে তারা যায় নি।" ভ্রাতৃগর্ব্বে পুলকিতা ভগিনীর কথায় বাধা দিয়া অনসূয়া বলিল, "আপনার স্বামী আপনাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান না?"

মা কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই খুকী তাড়াতাড়ি বলিল, "হ্যাঁ মা, সেই যে বাবা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী নিয়ে গেছল, সেইটা বল না।" মেয়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আঁচলে উদ্গত অশ্রু মার্জ্জনা করিতে করিতে মেয়ের মা বলিল, "আর ভাই, সে কথা বল কেন? আমার কপালে কি সে সব সুখ আছে? কপাল আজ দু-মাস হল পুড়েছে। তার উপর আজ তিন দিন হ'ল বর্দ্ধমানে শ্বশুর মারা পড়েছেন, সেখানে চলেছি তাঁর শেষ কাজ করতে।" অনসূয়া লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, খুকীর মা'র হাত দুইখানা নিরাভরণ— সিঁথিতে সিন্দুরও নাই। সে সহানুভূতির সুরে বলিল, "আপনার বড় কষ্ট দেখ্‌ছি। শ্বশুর বাড়ীতে আপনাকে দেখ্‌বার শোনবার আর বুঝি কেউ নেই? মেয়েটিও ত ছোট, মানুষ করে তুল্‌তে অনেক সময় লাগ্‌বে। তার ব্যবস্থা কে করবেন?"

খুকীর মা দার্শনিকের মত হাত নাড়িয়া সুর করিয়া বলিল, "সংসারটাই এমনি ভাই, ভেবে কি করব? জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আমি যদি আজ মরি, তাহলেই বা ওদের কে করবে? আছি তাই ভাগ্যি, তারপর যা থাকে অদেষ্ট।"

অনসূয়া হতাশ হইয়া পড়িল। ইহার পর কি বলা যায় সে ভাবিয়া খুজিয়া পাইতেছিল না। বিধবা নিজেই আবার কথা পাড়িল। শোকে তাহার উৎসাহ কিছু কম হইয়াছে মনে হইল না। "কার সঙ্গে যাচ্ছেন অত দূরে? আপনার কি হন উনি?"

যাহার সঙ্গে অনসূয়া যাইতেছিল, তাহার একটা কিছু পরিচয় দেওয়া শক্ত ছিল না, কারণ সব মানুষেরই একটা পরিচয় থাকে। কিন্তু তিনি যে অনসূয়ার ঠিক কে হন, তাহা তাহার জানা ছিল না; বলিতে

হইলে দুই জনেরই বংশ তালিকা খোঁজ করিতে হইত। কিন্তু রমণীটির কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া ও প্রশ্ন শুনিয়া সঙ্গীর সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতানো তাহার নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইল। অনসূয়া চট্ করিয়া বলিয়া বসিল, "আমার ভাই হন উনি।"

বিধবা বলিল, "সোয়ামীর কাছে যাচ্ছেন বুঝি ?"

অনসূয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল. "না!" বিধবা এ উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "তবে বুঝি বাপের কাছে ? ভাই নিতে এসছিল, না ?"

অনসূয়া বলিল, "না, আমার বাবা দিল্লীতে থাকেন না। তিনি কলকাতাতেই থাকেন।" বিধবা বলিল, "ওমা, তবে দিল্লী যাচ্ছ কেন গা খামকা ? বেড়াতে যাচ্ছ বুঝি ? তা সোয়ামী-পুত্তুর ফেলে যাচ্ছ কি করে ভাই ?"

অনসূয়া বলিল, "নেই বলেই ফেলে যেতে পারছি। সেখানে আমি বেড়াতে যাচ্ছিনে, পড়তে যাচ্ছি।"

বিধবা অকস্মাৎ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিল, "ও বেম্মজ্ঞানী বুঝি ? এখনও বিয়ে-থা করো নি ! পাশ দিয়েছ নাকি ভাই ?"

অনসূয়া বলিল, "হ্যাঁ, পাশ দিয়েছি।"

খুকীর মা বলিল, "ক'টা, একটা না দুটো ?"

অনসূয়া বলিল, "ছ' টা"।

বিধবার চক্ষু দুইটি বিস্ময়ে, সন্দেহে ও কৌতূহলে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; সে বলিল, "ও বাবা, ছ'টা পাশ দিয়েছ ! আবার কি পড়বে ভাই, ব্যারিষ্টারি না জজিয়তি ? অনেক টাকা উপায় করবে, না ?

তা হ্যাঁ ভাই, তোমার বাপ-মা আছেন ত? তাঁরা মেয়ের বিয়ে দেবেন না নাকি?"

অনসূয়া হাসিয়া বলিল, "কি জানি?"

সঙ্গিনী তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। হঠাৎ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "জানেন বই কি! আমাকে বলবেন না, না? হ্যাঁ ভাই, আপনার ভাইবোন ক'টি?"

অনসূয়া বলিল, "তিন বোন্ তিন ভাই।"

সঙ্গিনী বলিল, "তাদের বিয়ে হয় নি?"

অনসূয়া বলিল, "ভাইদের হয় নি, বোন-দুটির হয়েছে।"

অনসূয়ার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনসূয়ার সঙ্গিনী বলিল, "আপনার কোথাও বিয়ের কথা-বার্ত্তা হচ্ছে না? কিছু ঠিক হয়েছে বুঝি? পাকাপাকি কথা হয়ে গেছে নাকি?"

অনসূয়া হাসিয়া কিছু বলিল না। মেয়েটি আবার জেরা সুরু করিল, "আপনার বোনেরা সব বিয়ে করেছেন, আপনিই কি আর না করে বসে থাক্‌বেন? বাপ-মা শুনবেন কেন? বলুন না, বল্‌তে দোষ কি, সব ঠিক হয়ে গেছে ত? অন্তত কথাটা ত হচ্ছে?"

অনসূয়া মুক্তি পাইবার আশায় বলিল, "কি জানি দেখুন—আমি ও সব খোঁজ রাখি না।"

ষ্টেশনে পাক্‌ড়াইয়া তাহার নাড়ী-নক্ষত্র জানিয়া লইবার ইহার আগ্রহ দেখিয়া অনসূয়া অবাক্ হইয়া গেল। কি করিয়া কথা ফিরাইবে ভাবিতে লাগিল। বিধবার কিন্তু কৌতূহল অদম্য। সে নূতন সূত্র

খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কি করিয়া আবার কথা তোলা যায়। কিছুক্ষণ যেন ভাবিয়া লইয়া সে বলিল, "আমার ভাই বিয়ে করেছিল ঢাকায়। তারা বেহ্মজ্ঞানী নয়, কিন্তু এমনি ধারাই লেখাপড়া করে। সে মেয়ে বেশ ডাগর হয়েছিল, পাশের পড়া পড়ছিল ইস্কুলে। আমার ভাইয়ের ভারি পছন্দ হয়েছিল মেয়েকে; তাই তা'র বাপ-মা আর পড়ালে না, ইস্কুল ছাড়িয়ে দিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলে; নইলে আপনারই মত অনেক পাশ দিতে পারত।"

অনসূয়া উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তা আপনার ভাই বৌকে আরো লেখাপড়া শেখালেই পারতেন! কত মেয়ে ত বিয়ের পর লেখাপড়া শিখে তিনটে চারটে পাশ করছে। আমাদের সঙ্গে একটি মেয়ে পড়্‌ত, সে বিয়ের আগে কথামালা পর্য্যন্ত......"

বাধা দিয়া সঙ্গিনী বলিল, "পড়াবে কি ভাই? সে বৌ কি আমাদের কপালে টিক্‌ল! সে আজ এক বছর হ'ল মারা পড়েছে। আর বরের যখন মনে ধরেছে তখন আর পড়বারই বা কি দরকার? খাবার-পরবার ত আর ভাবনা নেই।" যখনই অনসূয়া উৎসাহের আবেগে অনেক কথা বলিতে যায় তখনই মৃত্যুর উল্লেখে তাহার কথার সূত্র ছিঁড়িয়া যাইতে দেখিয়া সে দমিয়া গেল। অথচ দেখিল মৃত্যু-ব্যথা ইহাকে কিছুমাত্র কাতর করে না। সে শুধু বলিল, "আপনার ভাইও দেখছি আপনারই মত দুঃখে পড়েছেন। কি আর করবেন বলুন, মরণকে ত ঠেকানো যায় না?"

তাহার সঙ্গিনী বলিল, "হ্যাঁ তা দুঃখ বই কি! অমন বউ নিয়ে দুদিন সাধ-আহ্লাদ করতে পেলে না। তবে ওরা ব্যাটা ছেলে ওদের কথা আলাদা। একটা যায় আর-একটা আসে। তেমনটি হোক আর

নাই হোক, বউ একটা জুটেই যায় ; বে'র যুগ্যি ছেলে কি আর পড়ে থাকে ! বাবা ত গেল অঘ্‌ঘানে আবার তার বিয়ে দিয়েছেন। সে প্রথমে করতে চায় নি, বাবা কিছুতেই ছাড়লেন না। বাপের কথা ত ফেল্‌তে পারে না, বিয়ে করতে হল। এ বউ আর সেই সে—বউ ! আকাশ আর পাতাল ! ভাইয়ের আমার একে মোটেই মনে ধরে নি। ধরবে কেন ? একি তার যুগ্যি ! পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ! আমার ভাই বলে—না জানে দুটো কথা বল্‌তে, না জানে ভাল ক'রে একখানা কাপড় পরতে, না জানে হাঁট্‌তে চল্‌তে, না জানে কিছু ! এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব ! বাবা বলেছিলেন বিয়ে করতে, করলাম। ব্যস্‌, আর আমার কোন দায় নেই। আমি ও জড়পুঁটুলি ঘাড়ে করে বেড়াতে পারব না। সে তোমরা জেনে রাখ, এ আমার পরিষ্কার কথা।—ভাইয়ের আমার বেম্মসমাজের মত ধরণ কি না, সবই তার ওই-রকম অভ্যেস হয়ে গেছে। বাবার যেমন জেদ ! তাকে কিনা একটা অজ পাড়াগেঁয়ে মুখ্‌খু মেয়ে জুটিয়ে দিলেন। সে নেবেই না ত ঘরে। দেখ্‌তে গিয়েই অপছন্দ করেছিল। ও বলে, এইবার আমি নিজে দেখে শুনে পছন্দ করে ঠিক মনের মত একটি বিয়ে করব। ওর বেম্মসমাজের উপরেই ঝোঁক আছে। ওমনিটি ও চায়।"

অনসূয়ার মনে নারীসমস্যার ও সমাজসংস্কারের নানা তর্ক জাগিয়া উঠিল। প্রতিদ্বন্দ্বী মনের মত না হইলেও চুপ করিয়া থাকা তাহার পক্ষে শক্ত হইতেছিল। অনসূয়া বলিল, "নিজে দেখেশুনে বিয়ে করাই ত ভাল। এই কথাটা আপনার ভাইয়ের আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল। যাকে পছন্দই হল না, তাকে বাবার কথায় বিয়ে

করে এখন অন্য মেয়ে খুঁজতে গেলে তার দশা কি হবে সেটাও ত ভাব্‌তে হবে।”

বিধবা কথাটা ঠিক বুঝিল কিনা সন্দেহ। সে বলিল, “তার জন্যে ভাবনা কি! সে মেয়েকে ত আমার ভাই নেবেই না বলেছে, নূতন বৌকে সতীনের জ্বালা পোয়াতে হবে না; সেদিকে আমার ভাই ঠিক আছে। সে তোমাদের সমাজে যেত কিনা! ও সব বোঝে-সোঝে।”

অনসূয়া হাসিয়া বলিল, “তা নয় হল; কিন্তু পুরানো বৌ-বেচারা যাবে কোথায়? আমি তার কথাই বলছিলাম।”

বিধবা আবার বলিল, “তার জন্যে অত ভয় কিসের? সে তার বাপ-ভেয়ের কাছে থাক্‌বে, এত জানা কথা। তাদের মেয়ে তারা রাখ্‌বে কি না রাখবে, তার ভাবনাও কি আমরা ভাবতে যাব? মেয়ে পছন্দ হয় নি—নিই নি; এখন তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? আমার ভাই ত বলেইছে আমি ত আর নিজে বিয়ে করতে যাই নি যে আমায় কিছু বলবে? বাবা সম্বন্ধ করেছিলেন, মেয়ের বাপ মেয়ে দান করেছিল। সে তাদের কথা তারা দুই বুড়ো বুঝবে। আমি পিতৃসত্য পালন করে খালাস। মেয়ে ঘরে নেবার কোন কথা আমার সঙ্গে হয় নি। এরপর আমি নিজের মনের মত মেয়ে দেখে ঘরে আন্‌ব।”

অনসূয়া এমন অকাট্য যুক্তির আর কোন উত্তর না দিয়া বলিল, “কিন্তু মেয়ের ত একটা পছন্দ আছে। মেয়ে যদি আপনার ভাইকে পছন্দ না করে?”

বিধবা প্রথমটা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল,

"ও, ঘরবরের কথা বল্‌ছেন ? তা আমাদের ঘর ভালই, কুলীন কায়েত, তিনকুলে কোথাও এতটুকু খুঁৎ খুঁজে পাবে না কেউ। বাপের জমি-জমা আছে, একখানা বাড়ী আছে গ্রামের সদরে। আর যদি বল আইন আদালতের কথা, তবে সেদিকেও আমার ভাই শক্ত আছে। নতুন বৌ আনবার আগেই পুরানো বউকে সাত টাকা মাসোরা বরাদ্দ করে দেবে। তাহলে আর টুঁশব্দটি করবার উপায় থাক্‌বে না। তারপর গিয়ে গাঁই গোত্রের কথা যদি বলে, তবে বলি, আমরা কি আর জানি নে যে ব্রাহ্মসমাজে ওসব মানে না। সে সব জেনে শুনেই না-ভাই এগোচ্ছে, ভাইকে আমার অপছন্দ করবার কিছু নেই। পুরুষ বেটাছেলে তার ত আর রং মেজে চুল চিরে দেখে নিতে হবে না।"

পৌরুষের এমন অটল মহিমার কাছে মাথা হেঁট না করিয়া যে উপায় নাই ভাবিয়া ভ্রাতৃ-সৌভাগ্যবতী রমণী অনসূয়াকে কথার উত্তর দিবার সময় না দিয়াই হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বয়স কত হয়েছে ভাই ?" হঠাৎ তাহাকে এমন প্রশ্ন করিতে শুনিয়া অনসূয়া বিপদ্ গণিয়া বলিল, "আমার বয়স অনেক হয়েছে। তার গাছ-পাথর নেই।"

মেয়েটি বলিল, "আমার সঙ্গে ঠাট্টা। আইবুড়ো মেয়ের আবার বয়স কি। কতই আর হবে, সতের কি আঠার।"

অন্ততঃ সাত-আট বৎসর বয়স কমিয়া যাওয়াতে অনসয়ার মনটা এতই খুসী হইয়া উঠিল যে, সত্যনিষ্ঠার খাতিরেও সে এ-কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। বলিল, "হ্যাঁ, কাছাকাছিই বলেছেন।" বিধবা বলিল, "তবে আর বেশী কি ? আজকাল কত বামুন কায়েতের ঘরে

কুড়ি বছরের মেয়েও পড়ে আছে দেখা যায়। এত হামেশাই হয়।”

একটু দম লইয়াই মেয়েটি আবার পুরা উৎসাহে কথা সুরু করিল, “তোমার বাপের নাম কি ? কি কাজ করেন ? দেশ কোথায় ? কতটাকা মাইনে পান ? তা হ্যাঁ ভাই, আপনার সমাজ ছেড়ে কায়েতের ছেলে বেহ্ম-সমাজে গেলেন কেন ? কিছু গোলমাল আছে নাকি ? আর থাক্‌লেই বা কি ? কল্‌কেতা সহরে কে কাকে চিন্‌ছে বল ! টাকা দিলেই গুরু-পুরুত-বামুন-নাপিত সব হাতের মুঠোয় এসে যায়।”

তাহার সম্বন্ধে মহিলার উৎসাহ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়াও অনসূয়া আর বাধা দিবার কিংবা কথা ঘুরাইয়া লইবার চেষ্টা করিল না। একলা ষ্টেশনে বসিয়া কাটানোর চেয়ে এমন শ্রুতিসুখকর আলোচনাটা তাহার কাছে অনেক ভাল লাগিতেছিল। অনসূয়া সাধ্যমত প্রশ্নের উত্তর দিয়া চলিতে লাগিল। পিতৃপরিচয়, বংশ-পরিচয়, আর্থিক পরিচয় সকলই যখন বিধবার মনের মত হইল, তখন সে আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরবে অনসূয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া লইয়া অকস্মাৎ চোরা চাহনিতে পাশের বেঞ্চের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া ঈষৎ অঙ্গুলি হেলাইয়া অনসয়াকে চুপি-চুপি বলিল, “ঐ যে আমার ভাই। দেখ্‌ছ না !”

এতক্ষণ অনসূয়া ভগিনীর সহিত কথা বলিতেই ব্যস্ত ছিল, ভাইকে ফিরিয়া দেখে নাই। এইবার একবার চকিতে চাহিয়া দেখিয়া লইল। ব্যগ্র একজোড়া চক্ষু এতক্ষণ ধরিয়া পিছন দিক হইতে যে তাহাকেই গ্রাস করিতেছিল, তাহা সে জানিত না, চাহিবা মাত্র বুঝিয়া দৃষ্টি-

নামাইয়া লইল, কিন্তু যতখানি দেখা দরকার তাহা দেখা তাহার হইয়া গিয়াছিল। বেঞ্চির হাতলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ চক্ষু ও কর্ণের সাহায্যে অনসূয়ার পরিচয় লইবার চেষ্টা করিতেছিল। লোকটির মাথার চুল উঠিয়া কপাল ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার উপরও বুরুষ চালনার চিহ্ন দেখা যায়; সস্তা স্বদেশী ক্রীমে ব্রণবহুল মুখখানা তৈলাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। গায়ে বুকখোলা কালো বনাতের কোট ও মোম পালিশ করা ঢালের মত সার্টের বাহার গিলটির বোতামে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শান্তিপুরে ধুতি, পাম্পস্যু, সূক্ষ্মাগ্র ছড়ি ও মণি-বন্ধের ঘড়ি প্রভৃতি আধুনিক বিলাসের সব উপকরণেই—সে দেহ সজ্জিত করিয়াছিল; রুমালে এক ছটাক এসেন্স ঢালিতেও যে ভুল হয় নাই, তাহাও দূর হইতেই বুঝা যাইতেছিল! কিন্তু এত চেষ্টাতেও পক্ষ্ম-হীন বর্ত্তুলাকার চক্ষুর দৃষ্টি স্নিগ্ধ মার্জ্জিত কি উজ্জ্বল করিতে পারে নাই; দেহ-সজ্জায় আধুনিক সভ্যতার অনেক ছাপ মারিয়া আসিলেও ভাবে ভঙ্গীতে তাহার সভ্যতা যতটুকু ছিল, সবটাই প্রাগৈতিহাসিক; অসভ্যতা টুকুই যে কেবল খাঁটি আধুনিক, তাহা তাহাকে চোখে দেখিয়া এবং এত বিস্তৃত পরিচয় শুনিয়া বুঝিতে কাহারও বাকি থাকে না।

অনসূয়ার সঙ্গিনী হঠাৎ বলিল, "ছেলেবেলা বলাইএর রং আরো মাজা ছিল, এখন কাজে-কর্ম্মে রোদে ঘুরে ঘুরে রং পোড় খেয়ে গেছে। বড় খোকাকে দেখ্‌লে বুঝ্‌বে বলাই সে বয়সে কেমন ছিল।"

বলাইএর ঐশ্বর্য্য যে কেবল স্ত্রীভাগ্যশোভিত তাহা নয়, পুত্র-সম্পদও তাহার আছে জানিয়া অনসূয়ার উৎসাহ আবার বাড়িয়া গেল। সে বলিল, "আপনার ভাই-পো আছে বুঝি?"

ভাইপোদের পিসি বলিল, "হ্যাঁ, ঘেটের কোলে দুটি আছে বৈকি ; বেঁচে থাক তারা ; বৌ-এর জন্যে ত আর তাদের ফেলে দিতে পারব না। বৌ যিনিই হোন, অত আদর সইবে না।"

অনাগতা বধূর ননদিনীর ঝঙ্কারটা শুনিয়া অনসূয়া খুসী হইল। বধূর ভাগ্যে যে কেবলই আদর-সোহাগ জুটিবে না তাহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। সে হাসিল। তাহার হাসি দেখিয়া সঙ্গিনী বলিল, "তা ছেলের ঝক্কি ত আর বৌকে সইতে হবে না ; বাড়ীতে দাসী-চাকর আছে, তারাই দেখ্‌বে। ভাইয়ের আমার পয়সার অভাব নেই।"

এবার অনসূয়ার সত্যই কৌতূহল জাগিল। সে বলিল, "আপনার ভাই বুঝি খুব লেখা-পড়া শিখেছেন ? কি করেন তিনি ?"

ভগিনী বলিল, "তা শিখেছে বই কি ! পাশের পড়া পছন্দ করে না, তাই একটা পাশ দিয়ে আর একটা পড়তে পড়তেই ছেড়ে দিলে। কিন্তু ইঞ্জিরী যা বলে আর বক্তিমা যা করে, সাহেবরা অমন পারে না। আমার ভাই, নামজাদা লোক, তুমি নাম শুনেছ নিশ্চয়।

অনসূয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি জানি, দেখে ত চেনা চেনা লাগছে না। কোথায় বক্তৃতা করেন আপনার ভাই ? কাউন্সিল-না স্বদেশী সভায় ? আমি স্বদেশী বক্তাদের সবাইকে দেখেছি ; তবে তাঁরা ত প্রায় সকলেই বাংলায় বক্তৃতা করেন। কাউন্সিলে ইংরিজী বক্তৃতা হয় বটে সেখানেও ত মেয়েদের ভোট-দেবার তর্কাতর্কির সময় গিয়েছি যারা বক্তৃতা করলেন তাঁদের মধ্যে ত আপনার ভাইকে দেখেছি মনে হচ্ছে না। উনি খুব পণ্ডিত লোক বুঝি। বাইরে বুঝি বেশী বেরোন না। সারাদিন কি পড়াশুনা নিয়েই থাকেন ?"

অনসূয়া মনে মনে ভাবিল মানুষটাকে দেখিয়া ত বিশেষ বিদ্বান মনে হইতেছে না, কি বসিবার ভঙ্গী, কোথায়ও ধীশক্তি, কি প্রতিভার কোনও

লক্ষণ দেখা যাইতেছে না ; কিন্তু তবু হয়ত লোকটা নামজাদা পণ্ডিতই হইবে। কত দেশ-বিখ্যাত নেতার চেহারা ত দীনদুঃখী মজুরের মত আছে, কত রাজা-মহারাজার ত ভোজপুরী দারোয়ানের মত চেহারা, কত বাগ্মী ত মুদীর দোকানের মালিকের মত বিশালবপু, তবে তাহার এই অনাবিষ্কৃত পণ্ডিতটিই বা কেন জমিদারের প্রসাদপুষ্ট, কর্ম্ম-বিমুখ, বিলাসী ভবঘুরের মত না দেখিতে হইবে ? বাহিরের খোলসে কি হয় ? ভিতরে হয়ত ইহার বিশ্ব-বিদ্যার আলো অন্তর উজ্জ্বল করিতেছে। কেতাবে সে প্রতিভাশালীদের কপাল, চোখ-নাকের বর্ণনা পড়িয়াছে অনেক, কিন্তু বাস্তব জগতে দেখিয়াছে প্রতিভাবানরা শতকরা পঞ্চাশ জনই কেতাবের আইন চেহারায় অমান্য করেন, কাজেই ইহাতে সে বিশেষ বিস্মিত হইল না। বিদ্যাপাগল অনসূয়ার মন এই পণ্ডিতটির পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। পণ্ডিতের পরিচয় কি উদ্দেশ্যে যে তাহার ভগিনী দিতেছে, সে-কথা তখনকার মত অনসূয়া ভুলিয়া গেল।তাহার মন নব বিদ্যার্ণবের অন্বেষণে ডুবুরীর মত সকল অপরিচয়ের তলায় তলাইয়া রত্ন উদ্ধারে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। "আপনার ভাই কোথায় ইংরাজী বক্তৃতা করেন বলুন ত ? কোন্ সভায়, কি বিষয়ে ? আপনি নিজে শুনেছেন নাকি কখনও ?"

গর্ব্বিত সুরে বিধবা বলিল, "না ভাই, ও সব মহা-মহা রথীর মাঝখানে আমি কোথায় যাব ! তবে ছোটখাট জায়গায় দু'চার বার লুকিয়ে শুনে এসেছি বটে। কলেজে, ইস্কুলে, সভায়, রাজারাজড়ার বাড়ীতে কত জায়গায় আমার ভাই বক্তৃতা করে, তার কি ঠিক আছে ?"

রাজা-রাজড়ার বাড়ীতেও যে ইংরাজী বক্তৃতা দিবার কি কারণ ঘটিতে পারে অনসূয়া ভাবিয়া পাইল না। সে বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বড়মানুষের বাড়ীতে পণ্ডিত ডেকে বক্তৃতা শোন্‌বার চলন

হয়েছে নাকি? তা ত আগে জান্‌তাম না; কি রকম বক্তৃতা বলুন ত সে! যে ডাকে তার বাড়ীতেই যান উনি বক্তৃতা শোনাতে?"

সে বলিল, "তা ভাই, পেট চালাতে হবে ত! আগে থেকে বায়না নিয়ে যাবে না? সেও কি কখনও হয়? তুমি কি ভাই সভায় কখনও যাও নি? বেম্ম-সমাজের মেয়ে পুরুষলোকের সামনে ত বেরোও তবে আমার ভেয়ের বক্তৃতা শোন নি বল্‌লে বিশ্বাস করি কি করে? ওই যে ভাই, সেই বক্তৃতা, যাকে কমিক না কি বলে তাই। এবার বুঝলে? আমার ভাই বলাইচাঁদ বিশ্বাসের মত হাসির কথা কেউ বল্‌তে পারে না।" অনসূয়ার চমক্ ভাঙিল। তাহার পণ্ডিতটি যে পয়সা লইয়া ভাঁড়ামির ব্যবসায় করেন এমন খবরটা সে এতক্ষণেও আন্দাজ করিতে পারে নি ভাবিয়া নিজের উপরই তাহার অশ্রদ্ধা হইতেছিল। এই তাহার বুদ্ধি! কিন্তু এমন একটা আবিষ্কারের আনন্দে তাহার হাসিও পাইতেছিল। প্রজাপতি যে তাহার উপর আজ সুপ্রসন্ন তাহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। সে আপন-মনে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল।

বলাইচাঁদের দিদি অনসূয়ার মৌন মুখ ও সলজ্জ হাসির মনোমত অর্থ করিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে ভাই, আমার অনেক কথা আছে। তোমার নামটি কি তাওত বল্‌লে না। আচ্ছা, আমরা ত এক গাড়িতেই যাচ্ছি, নিরিবিলি কথা হবে এখন। পাকাপাকি সব বলে ফেলা ভাল। ওই ত গাড়ী এসে পড়ল।"

গাড়ী আসিতেই বলাইচাঁদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া হঠাৎ নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই যে এইদিকে মেয়ে গাড়ী, আপনারা এদিকে আসুন।"

অনসূয়া তাহার সঙ্গীকে বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার অ্যানাটমির

নোটটা মিলিয়ে নিতে হবে ভাল করে। চলুন সেকেণ্ড ক্লাসে ছেলেদের গাড়ীতে একসঙ্গে ওঠা যাক। মেয়েগাড়ীতে গেলে বড় সময় নষ্ট হয়; সে সময়ে একটা সাবজেক্ট আগাগোড়া পড়ে ফেলা যায়। দিল্লী ত কম পথ নয়। পরের একটা ষ্টেশনে গিয়ে একসেস ফেয়ার দিয়ে টিকিট ঠিক করে নিলেই চল্‌বে।"

অর্থনীতিতে পণ্ডিতা মিতব্যয়ী অনসূয়ার এই প্রস্তাবে তাহার সঙ্গী কিছু বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু প্রতিবাদ করিল না। কারণ, প্রতিবাদ কিংবা তর্ক করিয়া অনসূয়াকে কেহ আজ পর্য্যন্ত বশ করিতে পারে নাই। তর্ক-শাস্ত্রে তাহার অগাধ বিদ্যা ছিল এবং সে বিষয়ে তাহার অহঙ্কার ছিল ততোধিক। বন্ধুজনে সে অহঙ্কার খর্ব্ব করিতে বিশেষ চেষ্টা করিত না।

বলাইচাঁদ দিদিকে মেয়ে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট কাটিবে কিনা ভাবিতে লাগিল।

সন্তান

বড় বউ প্রসাধনে ব্যস্ত। আয়না টেবিলের পাশেই খাটের উপর ময়ূরকণ্ঠী, বেগুনফুলি ও আগুন রঙের তিনখানা জরির জংলা বেনারসী শাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে, হাতকাটা কিংখাবের জামা ও চওড়া-সুরাটি জরির পাড়বসানো হলুদ রঙের জামা দুটির ভিতর কোন্‌টি বেনারসীর সঙ্গে বেশী মানাইবে ভাবিতে ভাবিতেই মুকুল চুলের রাশির ভিতর দিয়া চিরুণী চালাইতেছে। টেবিলে একটা ছোট গালার কাজ-করা বাক্সের ডালার উপর একছড়া মুক্তার মালা ও একটি হীরার কণ্ঠি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। খোঁপাটা মুকুলের মনের মত হইল না, বড় ঘাড়ের কাছে নামিয়া পড়িয়াছে; আবার গোড়ার ফিতাটা খুলিয়া ফেলিয়া বড় চিরুণী দিয়া সমস্ত চুলের গোছা সে ঠেলিয়া মাথার প্রায় মাঝখানে আনিয়া ফেলিল। ফিতাটা বাঁধিয়া টেবিলের আয়নার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়-করা আয়নার ভিতর চাহিল, দুই হাতে আলগা খোঁপাটা তুলিয়া ধরিয়া দেখিল এবার দিব্য মানাইয়াছে; উঁচু খোঁপার তলায় অজন্তার ছবির মত চূর্ণ কুন্তলগুলি শুভ্র ঘাড়ের কাছে দুলিতেছে। এমন খোঁপা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে বলিয়া মনে দুঃখ হইতেছে বটে, কিন্তু যেমন তেমন খোঁপার উপর মাথার কাপড়ই কি তেমন মানায়?

ছোট ননদ মায়া ঘরে ঢুকিয়াই গালে হাত দিয়া বলিল, "বাপরে বাপ, আজ কার বিয়ে বৌদি, দাদার না—ছোড়দার? রূপে ত নূতন বৌদিকে হার মানিয়েছ, আবার সাজেও যদি সকলকে তাক লাগিয়ে দাও ত সে বেচারীকে যে কেউ দেখবেই না!"

মুকুল মুখনাড়া দিয়া বলিল, "তা কি করতে হবে শুনি? মুখে খানিকটা কালি মেখে আর গয়না কাপড়গুলো আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে এলে যদি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ত বল তাই না হয় করা যাচ্ছে।"

মায়া বেচারী ভালমানুষ, তাড়াতাড়ি নরম হইয়া বলিল, "না ভাই, তা কেন? তোমার দিব্যি ঝাড়া হাত-পা, তুমি সাজবে না ত কি আর আমরা চারটে ছেলে কোলে কাঁখে ঝুলিয়ে সেজে বেড়াব?"

মুকুল ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "ঐ ত বিপদ! ঝাড়া হাত-পার হিংসেতেও বাঁচ না, আবার যতদিন না একটি এসে চ্যাঁ-ভ্যাঁ করবে তত দিন নেই নেই ক'রে নাকে কান্নারও শেষ নেই। আমি বাপু ও-সবের ধার ধারি না। আমার কোনোদিনই ও-সব সাধ ছিল না। বাঙালীর ছেলে আজ পেট ছাড়ছে, কাল পিলে বাড়ছে, অমন সম্পদ একটি পেয়ে লাভের মধ্যে নিজেরও ত আহারনিদ্রা যায় ঘুচে, তার চেয়ে যেমন আছি বেশ আছি।"

মায়া বলিল, "তাই ব'লে একেবারে খালি খাঁ খাঁ বাড়ি আবার কারুর ভাল লাগে শুনি নি।" মুকুল বেগুনফুলি শাড়ীটা ঘুরাইয়া পরিয়া মাথার কাপড় টানিতে টানিতেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মায়ার কথার আর উত্তর দিল না।

মেজ পিসিমা পিছনের দরজা দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঢুকিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁগা বৌমা, মিষ্টির ঘরের চাবি খোলা পড়ে রয়েছে, সব যে লুট হয়ে যাবে বাছা।"

মায়া বলিল, "বৌদি নিজের গয়না-কাপড়ের ভাবনাতেই অস্থির ত ভাঁড়ার সামলায় কখন বল। এই ত সবে সাজ শেষ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমাদের চারটে ছেলে টেনেও বিশ্ব মাথায় ক'রে

বেড়াতে হয় আর এঁদের নিজেদের খেয়ে শুয়েই কোনো কাজের আর অবসর মেলে না।”

পিসিমা বলিলেন, “বেঁচে থাক ওরা ষেটের কোলে ; তুই এসেছিস ব'লে তবু ঘরে দুটো কচি-কাচার মুখ দেখে বাঁচ্‌ছি। নইলে বাড়ি নয়ত পিঁজরাপোল। ওদিকে দাদা বাতের ব্যথা নিয়ে কোঁকাচ্ছে, এদিকে হাঁপানি নিয়ে আমি ফোঁস্ ফোঁস্ করছি। ছেলে দুটোর ত সারা দিনে দেখা নেই, রাত দশটা বাজলে তবে ঘরে পা দেয়। বৌও হয়েছেন তেমনি ; দোকান, বাজার, স্যাকরা আর দরজির সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক, ল্যাজে একটা মোটর বেঁধে সারাদিন ত তাই ক'রে বেড়াচ্ছেন। থাক্‌ত কোলে একটা কিছু ত দু-দণ্ড নাড়তে চাড়তেও ঘরে মন বস্‌ত।”

মায়া বলিল, “সাত বছর ত হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে, আর কবে হবে বল ? আমারই ত বয়স, বৌদির বিয়ের সময়ই আমার পানু ছ-মাসের ছেলে। এইবার একটা ডাক্তার-টাক্তার দেখালে পারে। বলতে গেলে ত মারতে আস্‌বে সব।”

পিসিমা বলিলেন, “তা মারতে আস্‌বে বইকি ! অমন স্বভাব না হ'লে আর অমন কপাল হবে কেন ? ছেলের মা হওয়া কত তপিস্যার ফল তা কি আর একালে কেউ বোঝে ? হ'ত সেকাল ত বুঝত ঠেলা। কাকীমার আমার বিয়ের আট বছর পেরিয়ে যেতেই ঠাকুরমা এনে গলায় সতীন গেঁথে দিলেন ; চিরটা কাল সতীলক্ষ্মী সব সহ্য করেছেন, কিন্তু নিজের অদৃষ্ট ছাড়া কাউকে দোষ দেন নি। একটা সখের জিনিষ কখনও ছোঁন নি, বল্‌তেন—কোন্ ভাগ্যে আমি ওসব ছোঁব, সিঁথির সিঁদুরটুকুই আমার বজায় থাকুক।”

মায়া বলিল, “সে-সব সেকালের কথায় কাজ কি বাপু, এখন

নতুন বৌটি বংশ বজায় রাখলেই আমরা বর্ত্তে যাই। এও মস্ত উনিশ বছরের মেয়ে, কেমন হবে কে জানে ?”

পিসিমা বলিলেন, ‘তার মার ত শুনি পাঁচ ছেলে তিন মেয়ে। এই ভরসাতেই ত আনা যে যাহোক দুটোচারটে কিছু হবে। নইলে শুধু টাকা ওড়াবার জন্যে ত বৌ করা নয়।”

মুকুল নববধূর বৌভাতের শাড়ীটা আলমারীতে তুলিয়া রাখিবার জন্য ঘরে আসিতেছিল আড়াল হইতে কথাটা শুনিল। নিমেষের জন্য তাহার মুখখানি অন্ধকার হইয়া গেল। তবু জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া সে ঘরে ঢুকিল। তখনও শুনিল মায়া বলিতেছে, “বাবার এই বিঘেজোড়া ঘরবাড়ি, মা’র কত সাধের সংসার, ঠাকুরমারই কি কম স্মৃতি এর মধ্যে ? খাট, আলমারী, বাসন-কোশন, সোনা-রূপো সবের সঙ্গে তাঁদের এতকালের মায়া পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। বৌদির যদি ছেলে পিলে না হয় তবে আর এ সবের অর্থ কি ?—”

মুকুল চৌকাঠে পা দিয়াই বলিল,“কেন ভাই ঠাকুরঝি, অত ভাবনা কিসের ? আমার মতই ত সবাই হয় না ! হলেও ত তোমার ছেলেরা রয়েছে, তারাই না হয় সংসার সাজিয়ে রাখ্‌বে।”

পিসিমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “বৌমা, আপন মামী হও, যেটের বাছাদের অমন ঠেস দিয়ে কথা ব’লো না।”

২

মুকুল তাহার রূপ যৌবন ও অলঙ্কার প্রসাধন লইয়া বেশ ছিল। মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচ সন্তানের এক সন্তান সে, বিবাহের আগে ঐশ্বর্য্য কি বিলাসের পরিচয় বিশেষ পায় নাই। ধনী আত্মীয়বন্ধুদের দেখিয়া যখন ইচ্ছা করিত বেনারসী শাড়ী পরে তখন তাহাকে শান্তিপুরে

ডুরে পরিয়াই খুশী হইতে হইত, যখন ইচ্ছা করিত প্রতি অঙ্গক্ষেপে রত্ন অলঙ্কার ঝঙ্কার দিয়া উঠুক, তখন দুই হাতে দুই গাছা তার-জড়ানো শাঁখা পরিয়াই তাহার দিন কাটিত। আয়নায় আপনার প্রসাধনের সহস্র ত্রুটি দেখিয়া মন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিত, কিন্তু মুখে কিছু বলিবার উপায় ছিল না—সে যে গরিবের ঘরের পাঁচটার একটা! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ রঙের জোরে হঠাৎ তাহার বিবাহ হইয়া গেল এমন ধনী লোকের ঘরে! মুকুল তাহার কুমারী জীবনের যত অপূর্ণ সাধ ও যত অনাস্বাদিত সুখের কথা নিজের কাছেও স্বীকার করিতে ভয় পাইত, আজ তাহারা সব নিজ নিজ দাবি লইয়া উপস্থিত হইল। শাড়ী, গহনা, গাড়ী, আসবাব, আমোদ-আহ্লাদ কোনও ভোগের ইচ্ছাই সে মিটাইতে ভুলিল না। এখনও একটা ইচ্ছা আর একটা ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিতেছে। সাত বছরে মুকুল অনেক সুখের মধ্যে বুঝিয়াছে মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। সারা জীবন যদি নিত্য নূতন আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে জীবনে আর কাম্য রহিল কি? ইহাই ত জীবন। কিন্তু আনন্দের এই পূর্ণ পসরার মাঝখানে শিশুর কচি মুখ কোনদিন উঁকি দেয় নাই। মুকুল মনে করিত সে-সবের জন্য জীবন ত পড়িয়াই আছে, এখন দুই দিন ও-সকল দায় ভুলিয়া জীবনটা ভোগ করিয়া লওয়াই ত পরম লাভ।

কিন্তু সাতটা বছর যে কাটিয়া গিয়াছে, সমস্ত সংসারে যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে তাহা মুকুল টের পাইল সুখস্বপ্নের মাঝখানে আজ প্রথম দেবরের বিবাহের পর।

ছোটবউ মাস-আষ্টেক হইল আসিয়াছে। তাহার শরীর ভাল যাইতেছিল না। মা তাহাকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। তাহারই ব্যবস্থা করিতে মুকুল আসিয়াছিল স্বামীর দরবারে।

দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ইজিচেয়ারের উপর বৈদ্যুতিক পাখা চালাইয়া জয়ন্তবাবু মুসোলিনি-চরিত্রের বিশেষত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। কিন্তু নিদ্রাদেবীর মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া তিনি প্রায় মুসোলিনীকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন, এমন সময় মুকুল আসিয়া মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া বলিল, "ওগো শোন, পরশু একটা ভাল দিন আছে, আজ যদি সুবিধে-মত খবর দিয়ে দিতে পার, তাহলে ওরা পরশু সকাল-সকাল ছোটবৌকে নিয়ে যেতে পারে।"

জয়ন্ত চেয়ারের হাতল হইতে পা নামাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া অর্দ্ধজড়িত স্বরে বলিলেন, "কেন, কেন, বৌমাকে নিয়ে যাবে কেন?"

মুকুল স্বামীকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, "কেন আবার? ন্যাকামি রাখ! জান না যেন কিছুই। প্রথমবার, এ সময় বাপের বাড়ি না পাঠালে কি চলে? মার মত যত্ন কে করতে পারবে?"

জয়ন্ত মুকুলের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "সুকান্তও দু-দিন বাদে ছেলের বাপ হবে! এই সেদিন বই-বগলে কলেজ ফাঁকি দেবার মতলব আঁটত, ভাবলেও হাসি পায়।"

জয়ন্ত হাসিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার হাসিটা নিছক হাসির মতই শুনাইল না, মুকুলের কানেও সে হাসিটা বেসুরা ঠেকিল। সে চির-কালের মত হাত নাড়িয়া কানের ঝুমকা দুলাইয়া ঠাট্টার সুরে কোনও জবাব দিতে পারিল না। জয়ন্ত মুকুলের হাতভরা চুড়িগুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে নিজেই কথা তুলিল, "আর কি? এইবার সুকান্তই হবে বাড়ির কর্ত্তা; বুড়ো বয়সে তার ছেলেপিলের হাততোলা খেয়েই আমরা থাক্‌ব। তার চেয়ে লোকদেখান সংসার ছেড়ে এখন থেকেই বানপ্রস্থ অভ্যাস করা যাক্, কি বল?"

মুকুলের মনের ভিতর সজোরে একটা ধাক্কা লাগিল। সে নারী হইয়াও একথা এতদিন ভুলিয়াছিল কি করিয়া ? লোকচক্ষে তাহার এ সাজোনো ঘর-সংসার—আড়ম্বর, আয়োজন, অলঙ্কার, প্রসাধন সকলই নিরর্থক, সকলই মন ভুলাইবার ক্ষণিক চেষ্টা ছাড়া আর কি ? সে যে সত্যসত্যই জীবনের আনন্দরস এই সকলের মধ্য হইতে আকণ্ঠ পান করিতেছিল বলিলে কে বিশ্বাস করিবে ? জীবনযাত্রার এই সমারোহে বসন্তের পুষ্পসম্ভারের মত বর্ণগন্ধের প্রাচুর্য্য আছে কিন্তু সৃষ্টিলীলায় এ যে নিষ্ফল, একথা সে আজ প্রথম অনুভব করিলেও স্বামী তাহার পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন ভাবিয়া মুকুলের মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। তবু অভিমানের সুরেই জয়ন্তর গা ঘেঁষিয়া বসিয়া লাল ঢাকাই শাড়ীর পাড়টা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে সে বলিল, "কেন আমরা দু-জনের দু-জনেই কি যথেষ্ট নই ? আমাদের নিজেদের বর্ত্তমান সুখ-সাধের কি কোনো মূল্য নেই ? সবই কি ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে ?"

জয়ন্ত মুকুলের গালে টোকা দিয়া বলিল, "মূল্য আছে বইকি মুকুল। কিন্তু বর্ত্তমান কতটুকু, একটা মুহূর্ত্তেরও কম নয় কি ? জীবন মানেই একটুখানি অতীত আর অনেকখানি ভবিষ্যৎ। সেই দিকে চেয়েই আমরা বেঁচে থাকি।"

মুকুল বলিল, "বাবা রে বাবা, দার্শনিকের তত্ত্ব-কথা এখন থাক্। ও-সব আমার মাথায় ঢুকবে না। তোমার যদি নিতান্তই ভবিষ্যৎ না হ'লে চল্‌ছে না ত সেকালের কর্ত্তাদের মত আরে একটা বিয়ে কর গে না।"

জয়ন্ত বলিল, "থাক্ মুকুল, তোমার মুখে ওসব কথা আর শুন্‌তে চাই না। ও সব বল্‌বার জন্যে এখনও অনেক সেকেলে বুড়ো বুড়ী বেঁচে আছে।"

মুকুলের বুকের ভিতর কে যেন একটা জ্বলন্ত ছ্যাঁকা লাগাইয়া দিল। ইহারই মধ্যে এ-কথাও তবে উঠিয়াছে! তাহার সাত বৎসরের ঘর-সংসার, তাহার একান্ত নিজস্ব স্বামী, সমস্তই এককথায় অনায়াসে মিথ্যা করিয়া দিবার কথা এই বিংশ শতাব্দীতেও মানুষ ভাবিতে পারে? মুকুলের চোখদুটি জলে টল টল করিয়া উঠিল। সে দূরে সরিয়া বসিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া স্বামীকে বলিল, "এ সব কথাও তোমাদের হয়েছে, অথচ আমাকে তুমি লুকিয়ে রেখেছ? আচ্ছা বেশ!" আর বেশী কথা মুকুলের জোগাইল না।

জয়ন্ত বলিল, "অন্যে যদি তোমার মনে কষ্ট দেবার মত কথা বলে তাহলেও সব এসে তোমার কানে কানে ব'লে যেতে হবে?"

মুকুল অভিমানভরে বলিল, "তোমার যদি শুন্‌তে মিষ্টি লাগে ত আমাকে আর বল্‌বে কেন বল?"

জয়ন্ত কথার উত্তর দিল না। আবার ইজি-চেয়ারে ঠেস দিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। মুকুল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কোন্ সেকেলে বুড়ো বুড়ী বলেছে ও-কথা বল না একবার! সাত বছর এক সঙ্গে ঘর ক'রে মুখ বুজে কথাগুলো শুনে এলে, একটা জবাব দিতে পার নি?"

জয়ন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি যন্ত্রণা? আমার গলা ধরে কি তারা বল্‌তে এসেছিল যে আমি জবাব করতে যাব? ওঁরা বলাবলি করছিলেন আমি শুনেছি। এ-রকম অবস্থায় মানুষ অমন দু-চার কথা ব'লে থাকে, তাতে রাগ করবার কি আছে?"

"তুমিও তাই বল্‌বে?" বলিয়া মুকুল দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

৩

বিবাহ হইয়া পর্য্যন্ত মুকুল বাপের বাড়ি থাকে নাই। কখনও কিছু উপলক্ষে নিমন্ত্রণ থাকিলে সেই দিনই সন্ধ্যায় আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিত। একে ত জয়ন্তদের বাড়ির বৌরা বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ নয়, মস্ত মানী ঘর কিনা। তাহার উপর এ-বাড়ির ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর বাপের বাড়ি গিয়া দেখাইতে মুকুলের লজ্জা করিত; সে গরিবের মেয়ে, শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া বাপকে কেন ছোট করিতে যাইবে? অথচ এই-সব রাজসমারোহ ছাড়িয়া যাইতেও মন চাহিত না।

কিন্তু এত দিন পরে সামান্য একটা ছুতা করিয়া স্বামীর সঙ্গে মস্ত কলহ বাধাইয়া সে বাপের বাড়ি চলিয়া গেল। দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা কে বলিয়াছিল জয়ন্ত কিছুতেই নাম করিল না, মুকুলের তাই প্রচণ্ড অভিমান।

বাপের বাড়ির সাদাসিধা সংসার। দুই ভাই, দুই ভাজ দুই জনের কোলেই ক্ষুদ্র শিশু। তাহাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, সাধ-আহ্লাদ এই শিশু দুইটিকে ঘিরিয়াই। বড়-বৌ সুধার মেয়ে আড়াই বছরের, ছোটবউ বীণার খোকা এই সবে এক বছরের হইল। সুধার খুকী টুকু সারাদিনই তোতাপাখীর মত ছড়া বলে, "বিত্তি পলে তাপুল তুপুল," নয়ত ছোট দুইটি কচি হাত মাথার উপর তুলিয়া পা বাঁকাইয়া নাচ সুরু করে, অথবা ছোট কোলটি পাতিয়া ভাইকে আদর করিবার জন্য কচি দুটি হাত বাড়াইয়া কাকীমাকে সাধ্যসাধনা করে, "একটু বাচ্চাকে আমাল কোলে দাও না।"

টুকুর পাকামি দেখিয়া দুই জায়ের হাসাহাসির অন্ত নাই। টুকুর রাগ হইলে সে যখন ফোলা ফোলা গাল দুটি আরও ফুলাইয়া ঘাড়ের ভিতর মুখ গুঁজিয়া বলিত, "তোমাল সঙ্গে আলি," তখন সুধা ঘরসংসার

সব ফেলিয়া ছুটিয়া আসিত খুকীকে কোলে তুলিয়া অজস্র চুমা দিয়া রাগ ভাঙাইবার জন্য।

খোকনকে লইয়া ত বাড়িসুদ্ধ পাগল। একে সে ছোট্ট একরত্তি, তাহাতে আবার বাড়ির প্রথম পুত্র। ঠাকুরমা তাহার জন্য সারাদিন পুরানো পাড়ের রঙীন সুতা তুলিতেছেন আর ছোট ছোট কাঁথায় ছড়া সেলাই করিতেছেন—"আমার বুক জুড়ানো ধন, আমায় পদ্মলোচন!" মা বিকালবেলা রান্নাবান্না সারিয়া কাজল-লতায় কাজল পাড়িয়া খোকাকে সাজাইতে বসে; তার পর তার কপালে মস্ত একটা কাজলের ফোঁটা পরাইয়া আদর করিয়া বলে,

"সাঁঝের বাতি নড়ে চড়ে
যে আমরা খোকনকে খোঁড়ে
পুড়ে মরে সে আঁধার কোণে"

খোকা কি বুঝে জানি না, কিন্তু খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠে বাপ জ্যাঠা আপিস হইতে ফিরিয়া সকলের আগে খোকনমণির খোঁজ করে। এক গা ধূলা মাখিয়া হামা দিতে দিতে খোকা জ্যাঠার জুতা দুটা গিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া নাচে। কোলে উঠিবার ভিক্ষা, সে যে আপনি উঠিতে জানে না। সেদিনও প্রতিদিনের মত সন্ধ্যায় খোকাখুকুকে ঘিরিয়া সভা বসিয়াছিল। কাকী বলিল, "টুকু, তুমি কাকে সবচেয়ে ভালবাস?" টুকু বলিল, "মাকে, বাবাকে, তোমাকে, ছোটভাইকে আর ঠাকুমাকে।"

মা বলিল, "সবাইকেই সবচেয়ে ভালবাসিস্, মুখ্খু কোথাকার?"

কাকী বলিল, "আমাকে কতটা বাসিস্?"

টুকু দুটি হাত যথাসম্ভব ছড়াইয়া বলিল, "এই এত্তখানি।"

মা বলিল, "আর আমাকে?"

টুকু বলিল, "আলো আলো, আকাশ পর্য্যন্ত।"

কাকী বলিল, "তবে রে দুষ্টু, তুমি না সবাইকে সমান ভালবাস?"

খোকা হামা দিয়া আসিয়া মার পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ডুট্টু বোকা।"

এমন কথা জগতে বোধ হয় আর কেহ কখনও বলে নাই। সকলে গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা দেখেছ, এরই মধ্যে ছেলের কি বোলচাল! পাকা ছেলে কোথাকার!"

টুকুও আঙল তুলিয়া খোকার মুখের কাছে গিয়া নাড়িয়া বলিল, "পাকা ছেলে কোথকার!"

যতটুকু সময় অবসর সুধা বীণার মুখে খোকা খুকু ছাড়া অন্য কথা নাই, যেন পৃথিবীতে আর কোন জীব কি পদার্থের অস্তিত্ব থাকা না-থাকায় তাহাদের কিছু আসিয়া যায় না। মুকুলের অলঙ্কার শাড়ী দুই দিনে পুরাতন হইয়া যায়, তাহার পর নূতন একটার কথা না ভাবিলে কোন রস পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাদের খোকা খুকু যে নিত্যই নূতন। হাজার হাজার বার মানবশিশু যে কথা বলিয়াছে, যে লীলা-চাঞ্চল্যের লহর তুলিয়াছে তাহা এই খোকাখুকুর প্রতি কথায় প্রতি অঙ্গক্ষেপে যেন সৃষ্টিতে প্রথম দেখা দিতেছে। মুকুল এই পৃথিবীতে পঁচিশ বৎসর বাস করিয়াও আজ তাহা প্রথম আবিষ্কার করিল।

খোকার চোখে ঘুম আসিয়াছিল। মা তাহাকে কোলের উপর টানিয়া আস্তে আস্তে দোলাইয়া গান ধরিল—"ধন, ধন, ধন, এ-ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন।" খোকা ছোট কচি মুঠিতে মা'র গলার হার চাপিয়া বুকের কাছে আগাইয়া আসিল।

আজ মুকুলের মনে বেদনার কাঁটা তাহাকে বুঝাইয়া দিল, মানুষ এ-সকল কথা শুধু ছড়া কাটিবার জন্যই লিখে নাই। কত যুগ ধরিয়া

কত মায়ের মনের কথা এই ছোট ছড়াটুকুর ভিতর পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহাদের বহু সাধনার আভাসও এই কথাগুলির ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই বুঝি তাহার আজ সত্যসত্যই বিশ্বাস হইল সন্তানের অভাবে স্বামী হয়ত আবার বিবাহ করিয়াও বসিতে পারে। মুকুল হঠাৎ উঠিয়া গিয়া ঠাকুরঘরে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া জোড়করে বলিল, "হে ঠাকুর, তোমায় কোনো দিন ডাকি নি, আজ বড় দুঃখে ডাক্‌ছি। কাণা খোঁড়া যা-হোক একটা কোলে দাও ঠাকুর, কিন্তু সতীন-যন্ত্রণা দিও না।"

নীচে তখনও বীণা খোকনকে সুর করিয়া ঘুম পাড়াইতেছিল,

"তারা কিসের গরব করে।
(তারা) আগুনে পুড়ে কেন না মরে।"

মুকুলের মনে হইল বীণা যেন তাহারই ধন-ঐশ্বর্য্যকে বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেছে।

৪

মুকুল আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। বিধাতা তাহার জেদ রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার অজ্ঞাতেই। সে জানিত না যে, যে-সন্তান না-হওয়ার দুঃখে ও অপমানে সে এত দিনের স্বামীর সংসার এক দিনেই ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল সেই সন্তানকে সে তখনই আপনার শরীরে বহন করিয়া বেড়াইতেছে।

একথা বুঝিবার পর আর সে অভিমান করিয়া স্বামীর নিকট হইতে দূরে পড়িয়া থাকিতে পারিল না। এসুসংবাদ স্বামীর আগে আর কাহাকেও সে দিতে পারে না, দেওয়া চলে না।

বাড়ি আসিয়া মুকুল সবার আগে তাহার রেশমের শাড়ীগুলা বাহির

করিয়া কাটিতে বসিল। এই কাপড়ের বোঝা আলমারীতে সাজাইয়া রাখিয়া কি হইবে? তাহার চেয়ে তাহার অনাগত শিশুদেবতার পূজা ইহাতে করিলে মনে অনেক তৃপ্তি পাওয়া যাইবে।

জয়ন্ত দেখিয়া বলিল, "ওকি ওকি, এ আবার কি রকমের পাগলামী? ছেলের মা'রা কি কেউ ভাল কাপড় আর পরে না? ওগুলোকে মিথ্যে কেটে কুটিকুটি করছ কেন? বাজারে এখনও অনেক সিল্কের দোকান আছে। তোমার ছেলেয় জামা-কাপড়ের কিছু অভাব হবে না।"

মুকুল লজ্জা পাইয়া বলিল, "না না, তার জন্যে নয়। ও কাপড়-গুলো পরতে আর আমার ভাল লাগে না, তাই কেটে ফেল্‌ছি। মানুষে কাট্‌লে তবু কোন কাজে আসে, পোকায় কাটলে ত সবটাই লোকসান।" তার পর মুখ ম্লান করিয়া বলিল,"তাছাড়া এই বুড়ো বয়সে ছেলেপিলে হওয়া, বাঁচব কি মরব কে জানে? তখন এক-আলমারী কাপড় দেখে তোমরা আপশোষ করবে, নয়ত সতীন এসে পরবে। বিয়ে ত তোমার ঠিকই হচ্ছিল, মাঝের থেকে আমি আবার ক'মাসের জন্যে বাগড়া দিলাম।"

জয়ন্ত বলিল, "আচ্ছা থাক্, অত বাজে কথা বকে কাজ নেই। সমস্ত ইউরোপ আমেরিকা সুদ্ধ মেয়ের বুড়ো বয়সে ছেলে হ'তে পারছে, আর তোমার বেলায় যমরাজা ওৎ পেতে ব'সে রয়েছেন আর কি?"

মুকুলের মনে সত্যসত্যই ভয় ঢুকিয়াছিল, হয়ত এবার তাহার যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। সব সুখ কি মানুষের বরাতে এক-সঙ্গে সহ্য হয়? তবু সে ভয়টা ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত আপনাকে নানা তত্ত্বকথা শুনাইয়া। মরণ ত মানুষের হইবেই এক দিন, দীর্ঘ আয়ুর পিছনে চিরকালব্যাপী শূন্যতা ফেলিয়া রাখিয়া মরার অপেক্ষা এই

মরণই ত তাহার ভাল। তাহার স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যে হিন্দুনারীর কাম্য সকল সুখই সে ভোগ করিয়াছে ; এখন যাইবার বেলা যদি বংশধারাকে চিরপ্রবাহিত রাখিবার আশা ও গৌরব লইয়া মরিতে পারে তাহা হইলে না-ই বা পৃথিবীতে আর কুড়ি-পঁচিশ বৎসর একই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখিল এবং একই অন্নজল বার বার খাইল ! যাহা সে কোনদিন দেখে নাই সেই সন্তানের মুখ একবারটি দেখিয়া হাসিয়া সে জগতের নিকট বিদায় লইতে পারিবে।

মুকুলের সন্তানের অভ্যর্থনার নানা আয়োজনের সঙ্গে দিন অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। ছেলের জামা, মোজা, টুপি, দোলা, খাট, গাড়ী কোনটারই অভাব পিতামাতা থাকিতে দিল না।

আশ্বিনের পূজার বাজনার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তদের বাড়িতে শঙ্খধ্বনির হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। পিসিমা, মায়া সবাই মহা ব্যস্ত। মুকুলের খোকা হইয়াছে। পিসিমা বলিলেন, "ওরে ডাক্ রে ডাক্, দাদাকে ডাক্। দুই হাতে গিনি নিয়ে আস্‌তে বল্, এত দিনে বংশপ্রদীপ ঘর আলো করতে এসেছে।"

মায়া বলিল, "গিনি হবে এখন, বৌদির ত চোখ উল্‌টে গিয়েছিল, সে আছে না গেছে তাই দেখ আগে। ছেলের আগে মাকে বাঁচিয়ে তোল, তারপর ওসব মাথামুণ্ডু ক'রো যত পার।"

ধাত্রী বলিল, "না গো দিদিমণি, বৌদিদি ঠিক সাম্‌লে উঠেছেন। তাঁর জন্যে কোন ভয় নেই। সোনার চাঁদকে একবার দেখিয়ে দাও, সকল দুঃখকষ্ট, সব যন্ত্রণা এক মুহূর্ত্তে ভুলে যাবেন।"

ঝি ছেলেকে তুলিয়া মুকুলের মুখের কাছে ধরিল। কি করুণ অসহায় মুখখানি। দেখিয়া মমতায় মুকুলের সারা প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। এ-ছেলে তাহার বাঁচিবে-ত ?

মোহর, গিনি, টাকা লইয়া, ঠাকুর্দ্দাদা, ঠাকুরমা, কাকা, পিসি সকলে দেখিয়া গেল। মুকুলের মনের ভিতর কেবলই দুরু দুরু করিতে লাগিল। ভগবান? এত সুখ তাহার সহিবে ত? এ-ছেলে যেন তাহার কোলজোড়া করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

৫

মুকুলের বুকভরা ভালবাসা ও দেহ-মন-প্রাণের যত্ন, আদর লইয়া মুকুলের ছেলে এক বছরের হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুকুলের মুখের হাসি একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে। ছেলে তাহার এত দিনেও উপুড় হইতে, বসিতে, কথা বলিতে কিছুই শিখে নাই। সে কলিকাতা শহরের কোন চিকিৎসকের সাহায্য লইতে বাকি রাখে নাই, কিন্তু সকলেই বলিয়াছে এ-রোগ শিবের অসাধ্য। ছেলের মেরুদণ্ডই জন্ম হইতে বিকৃত। ইহার চিরজীবন এমনই করিয়া কাটিয়া যাইবে।

শিশু মাকে চিনিতে শিখিয়াছে, মাকে দেখিলে হাসে, মা চলিয়া গেলে কাঁদে। ডাক্তার বলে, "ইহার বুদ্ধির কোনো অভাব হইবে না। সবই বুঝিবে, তবে চিরজীবনই পরের উপর নির্ভর করিতে হইবে।"

মুকুল বলে, "ভগবান সবই যদি ওর বাদ দিলেন, বুদ্ধিটুকুও না দিলেই পারতেন; আপনার দুর্ভাগ্য তা হলে আর কোন দিন বুঝতে হ'ত না ওকে।"

ছেলে যত মা'র মুখের দিকে চাহিয়া হাসে, মা'র চোখ দিয়া ততই জল পড়ে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুকুলের দুই চোখ লাল হইয়া গিয়াছে। সে দিবারাত্রি ছেলে লইয়াই পড়িয়া আছে, তাহার বেশভূষা আমোদ-আহ্লাদ সব যেন পূর্ব্বজন্মের বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে।

এ-মুকুল যেন সে-মুকুলই নয়। জয়ন্ত দেখিল, এমন করিলে ইহাকে বাঁচানোও মুস্কিল হইবে। মুকুলকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইয়া সে বলিল, "দেখ, মানুষের পাঁচটা আঙুল কিছু সমান হয় না। একটা ছেলে অমন হয়েছে ব'লে তার জন্যেই কি প্রাণটা দিতে হবে। বেঁচে থাক্‌লে আরও পাঁচটা ভাল ত হ'তে পারে। সবগুলোই অমনি হবে না।"

মুকুল বলিল, "আর আমার বেঁচে পাঁচটা ছেলে নিয়ে কাজ নেই। আমি স্বার্থপরের মত দেবতার দোর ধরে কাণাখোঁড়া ছেলে চেয়েছিলাম। ভগবান আমাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন। এর চেয়ে সতীন হওয়াও ভাল ছিল। দুঃখ পেতাম আমিই পেতাম! আমার বন্ধ্যা নাম ঘোচাতে চিরটা জীবন ধরে আমার প্রাণের বাড়া বাছা ত দুঃখ পেত না।"

বেকার-সমস্যা

মা বলিলেন, "হ্যাঁরে শিবু, ছেলেদের গায়ে শীতের কাপড় নেই, মেয়েটাকে তিন বছরে একবার শ্বশুরবাড়ী থেকে আন্‌তে পারলাম না, অসুখে-বিসুখে কারুর মুখে এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারি না, চিরটা কাল এমনি করেই কি কাটবে ?"

ছেলে শিবরাম মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া বলিল, "ভাগ্যে যদি তাই থাকে ত কে খণ্ডাতে পারে ?"

মা ছেলের পাতে একহাতা গরম ডাল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "অবাক্ করলি বাছা তুই ! সর্ব্বস্ব খুইয়ে তোকে যে এম-এ পাশ করালাম সে কি ভাগ্যি মানাবার জন্যে ? যে টাকা তোর পিছনে ষোল বচ্ছর ঢেলেছি তার সিকিও যদি এই দু' বছরে তুলে দিতে পারতিস ত আমার সংসারের এমন দুর্দ্দশা হত না। দু' বেলা খাবি-দাবি, জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবি, এই কি তোর উচিত কাজ ? টাকা-পয়সা আনবার জন্যে একটু চেষ্টা-চরিত্তির করতে হয় না ?"

শিবরাম রাগ করিয়া পাত ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "আবার কি রকম করে চেষ্টা-চরিত্তির করতে হবে ? পা উঁচু করে মাথা দিয়ে হাঁটব ? তোমার কি ধারণা যে, দু' বেলা জামা গায়ে দিয়ে আমি বায়োস্কোপ থিয়েটার দেখে বেড়াই ? চেষ্টা করতেই ত যাই।"

মা বলিলেন, "আমি আর কি করব বাছা ? যা বোঝ তাই কর।" তিনি হতাশ হইয়া ডালের হাতা ও কাঁশিটা তুলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। শিবরাম বৈঠকখানা ঘরে গিয়া সতরঞ্চি-ঢাকা তক্তাপোষটার উপর খবরের কাগজগুলি লইয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

বাড়ীতে খবরের কাগজ কিনিবার পয়সা তাহাকে কেহ দিত না। দিবেই বা কে? বিধবা মায়ের সামান্য পুঁজিপাটার উপর তাহারই উপার্জ্জিত মাসিক ত্রিশ টাকা যোগ করিয়া সংসার কায়ক্লেশে চলে। তাই যে ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ী রোজ সকালে সে ছেলে পড়াইতে যায়, তাঁহাদেরই আগের দিনের পড়া ষ্টেট্‌সম্যান কাগজখানা সে চাহিয়া পড়িতে আনে। পরের দিন আবার ফিরাইয়া দেয়। বড়রাস্তার উপরের 'খদ্দর-ভাণ্ডার' হইতে একখানা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ও বলিয়া-কহিয়া সংগ্রহ করে। দুপুরে ভাত খাইবার পর এই কাগজ দুইখানির 'ওয়াণ্টেড' কলম মুখস্থ করিয়া ফেলা তাহার কাজ। দরখাস্তও সে কাগজ দেখিয়া কম করে নাই, কিন্তু বেশীর ভাগেরই কোন উত্তর পায় নাই। জবাব পাইয়া অদৃষ্টপরীক্ষার আশায় যে দুইচার জায়গায় বুক বাঁধিয়া গিয়াছিল, সর্ব্বত্রই হতাশার কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

শিবরাম পত্রিকার পাতা উল্টাইয়া দেখিল, তাহার মত ইতিহাসে এম-এ পাশ উমেদারের জন্য কোন চাহিদা নাই। দেশশুদ্ধ লোকেই জীবনবীমা কোম্পানী খুলিয়াছে এবং সকলেই এজেণ্ট চায়। বীমা-কোম্পানীর এজেণ্ট হইতে তাহার যে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল তাহা নয়। কিন্তু এ উপায়ে রাতারাতি বড়লোক হইবার আশা যে তাহার একেবারেই নাই তাহা শিবরাম জানিত। শিবরাম চোখ বুজিয়া একবার নিজের পরিচিত সব লোকের মুখ ভাবিয়া লইল। তাহার ভিতর বীমা করিবার মত টাকা শতকরা নব্বই জনের নাই। দুই দশ জনের যাও বা কিছু টাকা-পয়সা আছে, তাহা বাহির করা যাইবে না, কারণ তাহারা নিজেরাই প্রায় প্রত্যেকে এক একটা বীমা-কোম্পানীর এজেণ্ট। বাকী থাকে তাহার মনিব ব্যারিষ্টার

মুকুন্দরাম গোস্বামী আর তাহার অধ্যাপক মিঃ সেন। দুই জনেরই বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের এজেণ্টরা কি আর এতদিন তাঁহাদের পাকড়াও করিতে ভুলিয়া আছে? শিবরাম আশা ছাড়িয়া দিল। তাহার দ্বারা একাজ হইবে না। অচেনা লোকের দরজায় দরজায় সে ঘুরিতে পারিবে না। কি বলিয়া যে কথা আরম্ভ করিবে তাহাই সে ভাবিয়া পায় না।

বাকী আছে জনকয়েক ধাত্রী ও গৃহশিক্ষকের পদ। প্রথম কাজটা লাভজনক ব্যবসায় বটে, কারণ ধাত্রীদের মত গহনা সে বড়লোকের গৃহিণীদেরও পরিতে দেখে নাই। কিন্তু এ কাজটা এজন্মে ত তাহার দ্বারা হইবে না। অনেক তপস্যার ফলে যে পুরুষ-জন্ম পাইয়াছে, আগামী জীবনে তাহা নাকচ করিতে পারিলে ভাবিয়া দেখা যাইবে। আর গৃহ-শিক্ষকের কাজ দুই বেলা ত দুইটা করিতেছেই, ইহার উপর আর খাটিবার তাহার ক্ষমতা নাই।

শিবরাম 'অমৃতবাজার'-খানা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ষ্টেটসম্যানটা খুলিল। হায় রে অদৃষ্ট! ধাত্রী, নর্স, লেডি ডাক্তার ও সুন্দরী তরুণী ইউরোপীয়ান মহিলা ছাড়া আর কাহারও কি এ মর-জগতে বাঁচিয়া থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই?

একটা বিড়ি টানিতে টানিতে বন্ধু নিত্যানন্দ ঘরে ঢুকিল। শিবরামের ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে বলিল, "কি রে শিবু, ক'টা চাকরী যোগাড় করলি?"

শিবু এ কাগজখানাও টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আর চাকরী! একি তোর সত্যযুগের পৃথিবী! এখন চাকরী পেতে হলে মুখে রুজ, ঠোঁটে লিপষ্টিক আর গায়ে সেণ্ট মেখে ঘাঘরা পরে বেরোতে হয়। আমার বিয়ে হলে ভাই, দুবেলা কন্যাকামনা করব, আর সব ক'টা

মেয়ের নাম রাখব মেরী; কেটি আর ডলি। এক পুরুষ তায় শিবরাম, আমাদের অদৃষ্টে সুখ হবে কোথা থেকে? অথচ টাকা রোজগার করি না বলে মা ত প্রায় ঘর থেকে খেদিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।"

নিত্যানন্দ শিবুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "মনের দুঃখে ভাই বলে কেঁদে ফেলিস্ না। এ স্বাবলম্বনের যুগ, চাকরী নাই করলি। একটা ব্যবসা-ট্যাবসা ফাঁদ না, আমিও তোর সঙ্গে ঝুলে পড়তে রাজি আছি। কষ্ট করলেই কেষ্ট পাওয়া যায়, জানিস্ ত! খাটলে আমাদের টাকা মারে কে?"

শিবু বলিল, "অত অপ্‌টিমিষ্ট হ'স নেরে নিতু। টাকায় টাকা টানে। শুধু হাতে ব্যবসা কি অমনি মুখের কথা?"

নিতু বলিল, "আচ্ছা ধর্, একটা চপকাটলেটের দোকান করলে হয় না? ওতে ত আর বেশী টাকা ঢালবার দরকার নেই। রোজ বিক্রী করে রোজকার টাকা ফিরে পাবি, তাইতেই মূলধন ক্রমে বাড়বে।"

শিবু হাসিয়া উঠিল। "রোজ যে সব বিক্রী হবে তার গ্যারান্টি তোকে কে দিলে? পরের দোকান থেকে চপ-কাটলেট কিনে খেতে বেশ লাগে, কিন্তু যখন নিজের দোকানের চপ-কাটলেট রাত্রিবেলা ট্রেশুদ্ধ ঘরে নিয়ে আসতে হবে, তখন সেগুলো গিলতেও গলায় আটকাবে, ফেলতেও চোখে বান ডাকবে। আর তোর মূলধন দিনকার দিনই শূন্যের দিকে নামতে থাকবে।"

নিতু বলিল, "দূর ভীরু কোথাকার! পুরুষ-বাচ্চার একটু সাহস না থাকলে কাজ হয়? ঐ যে সংস্কৃতে কি বলে—'উদ্যোগিনং' সে কথাও কি ভুলে গেছিস?"

শিবু বলিল, "কি জানি বাবা, সেই কবে ম্যাট্রিকুলেশনে সংস্কৃত পড়েছি, সিংহ-টিংহ মনে নেই। 'বৃদ্ধ ব্যাঘ্রেণ সংপ্রাপ্তঃ পথিকঃ সমৃতো যথা' এইটুকু মনে আছে, তাও হয়ত সবটাই ব্যাকরণ ভুল।"

নিতু হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা যেখানে বাঘ-ভালুক কিছুর ভয় নেই সেই রকম একটা নিরাপদ ব্যবসা করা যায় না? এক পয়সাও মূলধন নেই, এক পয়সা লোকসানও নেই। শুধু একটা গেরুয়া পাগড়ী আর একখানা হাত দেখার বই।"

শিবু বলিল, "নিরাপদই বটে! কি না কি বলে বসব লোককে, তার পর না ফললে মার খেয়ে বেঘোরে পৈতৃক প্রাণটা যাক। তাছাড়া কলকাতার সহরে কোনখানে তুমি লুকিয়ে থাকবে শুনি? যত সব কলেজের ছোঁড়াগুলোর কাছে একবার যদি ধরা পড়ে যাই ত লোক-সমাজে আর মুখ দেখাতে পারব না।"

নিতু বলিল, "ওরে আমার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! হাত দেখা কি এমন মহাপাপ যে তুই মুখ দেখাতে পারবি না?"

শিবু বলিল, "বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলব আর লোকের কাছ থেকে পয়সা নেব তবু পাপ যদি না হয়, তাহলে মানুষ খুন ছাড়া কিছুই পাপ নয়।"

নিতু বলিল, "ব্যবসাদার মাত্রই মিথ্যে কথা বলে। উকিল, ব্যারিষ্টার, গুরু, পুরুত, স্যাকরা, ধোপা, নাপিত যে যা বলে সব বেদবাক্য তুই বলতে চাস?"

শিবু বলিল, "আমি কিছু বলতেও চাই না, তোর সঙ্গে আর তর্কও করছি না। এইবার আমি চুপ করলাম। বাইরে টহল দিয়ে কিছু প্রেরণা পাওয়া যায় কি না দেখি।"

নিত্যানন্দ আর একটা বিড়ি ধরাইয়া বাহির হইয়া গেল!

শিবরাম গায়ে সার্টটা চড়াইয়া উল্‌টাপথে বাহির হইল। রাস্তার দুইধারের যত ডাইং এণ্ড ক্লিনিং কোম্পানী আর হেয়ার ড্রেসিং সেলুনগুলির দিকে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া রহিল। এখানে মূলধনের বেশী বালাই নাই, সন্দেশ কিম্বা চপ পচিয়া নষ্ট হয় না, নিরাপদ ব্যবসায় বটে। কিন্তু কাপড় কাচিতে অথবা চুল কাটিতে ত সে নিজে পারিবে না, ধোপা নাপিতকে মাস পোহাইলে মাহিনা দিতে হইবে, তাছাড়া আছে ঘরভাড়া। যদি খদ্দের না জুটাইতে পারে তখন এই কয়টা টাকাই বা সে কোথা হইতে দিবে? নাপিতের দোকানে লুকাইয়া কিছুদিন এপ্রেন্টিস খাটিলে হইত। তারপর সুট পরিয়া হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে চুলকাটার ব্যবসা সুরু করিলে তাকে ঠাট্টা করিবার সাহস আর কাহারও হইবে না। কিন্তু কলিকাতায় অজ্ঞাতবাস যে বড়ই কঠিন ব্যাপার। মান খোয়াইবার ভয় শিবরামের বড় বেশী।

সন্ধ্যাবেলা দ্বিতীয় টুইশনিটা একেবারে সারিয়া কেশ তৈল, দাদের মলম, জ্বরের মহৌষধ প্রভৃতি অর্থ-সৃষ্টির নানা প্রচলিত পন্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বাড়ী ফিরিল। জিনিষগুলি করা কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু যাহাকেই জিজ্ঞাসা কর সেই বলে, "জয়ঢাক ঘাড়ে করে সারা বাংলা বেড়াতে পারলে তবে বিক্রী হবে। নইলে ঘরের শোভা-বর্দ্ধন ছাড়া আর কোনও কাজ হবে না।"

বাড়ীতে ঢুকিয়া সে দেখিল, এই সন্ধ্যাবেলা কাজের সময় মার রান্নাঘরের সম্মুখের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া মস্ত সভা বসিয়া গিয়াছে; পাড়ার যতগুলি সন্তানহীনা বিধবা ও পেনসান্‌প্রাপ্ত গৃহিণী কি একটা সুসমাচার লইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া শিবরামের মাকে শুনাইতেছেন। মা খুন্তি হাতে একবার রান্নাঘরে ঢুকিয়া কড়ার তরকারীটা নাড়িয়া দিয়া

আসিতেছেন, আবার বারান্দায় আসিয়া একটু দূরে আলগোছে দাঁড়াইয়া মহিলাদের বক্তব্য ও উপদেশ শুনিতেছেন। দেয়ালের গায়ে পেরেকে টাঙানো হ্যারিকেনের আলোয় কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না, তবে পাড়ার এই বর্ষিয়সী অভিভাবিকারা শিবুর এতই পরিচিত যে, তাঁহাদের কণ্ঠস্বর ও দেহের আয়তন দেখিয়াই কোন্ জন যে কে তাহা সে অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারে।

বৈঠকখানা ঘরে শিবরামের পদশব্দ পাইতেই মহিলাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সকলে প্রায় একসঙ্গেই হাতের উপর ভর দিয়া দেহভারকে সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। দলের নেত্রী পাড়ার তারিণী দিদি নেড়া মাথায় থান কাপড়ের ঘোমটাটা কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া কোমর বাঁকাইয়া কোন প্রকারে শিবুর মার কাছে অগ্রসর হইয়া গলার স্বরটা নীচু করিয়া বলিলেন, "তোমার ছেলে ঘরে এসেছে, খেতে ধুতে দাওগে যাও। কিন্তু কথাটা ভুলো না, ভেবে চিন্তে দেখ। কাল আমি আবার খবর নিয়ে যাব।'

শিবুর মা খুন্তি হাতে সাবধানে একটু পিছু হাঁটিয়া বলিলেন, "তোমরা সুখে দুঃখে সব তাতে আছ, তোমাদের কথা কি ভুলতে পারি ভাই!"

খিড়কীর দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হইতে চলমান সভার কথা চলিতে লাগিল। একেবারে দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের শেষ কথা বলিয়া লইয়া মহিলারা পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শিবুর মা কনুইএর গুঁতা দিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া দাওয়ায় উঠিয়া ডাকিলেন, "ও শিবু, হাত পা ধুয়ে এসে বোস। গরম গরম যা হয়েছে, চাট্টী খেয়ে নে। ঠাণ্ডা হলে এ ঘাসপাতা কি আর মুখে রুচবে?"

শিবু আসিয়া পিঁড়ির উপর বসিয়া দেখিল, মার মেজাজটা এবেলা অনেক নরম।

গরম রুটি, খোসা চচ্চড়ি ও মাছের ঝোল কোলের কাছে নামাইয়া দিয়া মা বলিলেন, "ষেটের কোলে পঁচিশ বছরেরটি ত হলি, এবার বিয়ে-থা তোর একটা দিতে হবে।"

শিবু বলিল, "কেন, সকাল বেলা হিসেব করে বুঝি দেখলে যে, তোমার টাকা ক'টা আমরা খেয়ে উঠতে পারছি না ? ভাগীদার না হলে এ কুবেরের ঐশ্বর্য্য শেষ করা যাবে না ?"

মা বলিলেন, "থাক্ থাক্, সব কথায় কথার প্যাঁচ কস্‌তে হবে না। বয়সকালে বিয়ে না করে কোন্ মানুষ থাকে ? যখনকার যা তখনকার তা। যা আজকাল দিনকাল, পায়ে শেকল না দিয়ে রাখলে কোন্ ছেলে যে কি করে বসেন তার ঠিক আছে ?"

শিবু বলিল, "তুমি যদি খেতে পরতে দিতে পার ত আমার আর কি ? দিব্যি চতুর্দ্দোলা চড়ে বিয়ে করে আসব।"

মা বলিলেন, "খেতে দেবার যোগ্যতা তোর কি কারুর চেয়ে কম করে ছেড়েছি ! কলেজের কোন্ ডিগ্রিটা বাকি আছে ? কিন্তু মা সরস্বতীর কৃপা হলেও মা লক্ষ্মী তাকালেন কই ?"

তাহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মাতার গৌরববোধ দেখিয়া শিবু মনে মনে হাসিল। হায়রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, মা সরস্বতী সকলের পাত চাটিতে শিখাইলেন কিন্তু অন্ন সংগ্রহ করিবার সামর্থ্যটুকু কাড়িয়া লইলেন !

শিবুকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মা বলিলেন, "সম্বন্ধ অনেক আসে, কিন্তু এবার যেটি এসেছে সে মেয়ে নয়ত রাজ-রাজেন্দ্রাণী। ছেলেবেলা তাকে আমি নিজেও দেখেছি, বড় হবার পর কে কোথায়

ছড়িয়ে যায়, আর চোখে পড়ে নি। কিন্তু তারিণী দিদি বললে সতের বছরের মেয়ে, লম্বা-চওড়া গোলগাল, হাত পা যেন মোমের বাতি, রং একেবারে ইহুদি মেয়েদের মত। ওপরের মুখে কোথাও খুঁৎ নেই, একরাশ চুল, ছোট্ট গড়ানে কপাল, টিকোলো নাক, পানের মত পুরন্ত মুখের কাট। শুধু নীচের মুখে একটু খুঁৎ আছে, ডান পাশের একটা দাঁত উঁচু, ঠোঁটের উপর এসে পড়ে।"

শিবরাম এই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়ে নাই, তবু তাহার মনে হইল সুন্দর মুখে এক পাশের একটি দাঁত অল্প একটু উঁচু হইলে বড় চমৎকার মানায়।

শিবরাম বলিল, "তারিণী মাসীর মত কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় যে মেয়ে এত ভাল উৎরেছে তাকে ত বিয়ে করাই উচিত। কিন্তু মা, তোমার ছেলেরও যে নীচের মুখে একটা খুঁৎ আছে।"

মা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "ওরে আমার রে? ব্যাটা ছেলের আবার খুঁৎ! অমন পড়ে গিয়ে দাড়িটা একটু কাটা অনেক লোকের থাকে।"

শিবু বলিল, "না, না, এযে তার চেয়ে বড় খুঁৎ। তোমার ছেলের খাবার মুখটা বড্ড বড়, চার বেলা না খেতে দিলে তার জাবর কাটার সুবিধা হয় না।"

মা বলিলেন, "বাপ মরে গেছে তাই তোমাদের সাধতে আসছে, নইলে ও মেয়ে বড় বড় ঘর থেকে লুফে নিয়ে যেত। মার সঙ্গে ফাজলামি না করে বিয়ে করবি কিনা সোজা কথায় বল।"

"পরে বলব এখন", বলিয়া শিবু কোন রকমে আহার সমাপন করিয়া পলায়ন করিল।

বিবাহও যে বাংলা দেশে অর্থ উপার্জ্জনের একটা পথ, সে কথা শিবরাম এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিল। সুন্দরী কন্যাটি পিতৃহীন শুনিয়াই তাহার সে কথা মনে পড়িয়া গেল। সে ভাবিল—বাংলা দেশের সুন্দরী ত! দুই দশ বৎসর পরে কোলে কাঁখে ছেলে ঝুলাইয়া গোবর-কালি মাখিয়া সুন্দরী অসুন্দরী সব সমান হইয়া যাইবে। তাহার চেয়ে যেখানে বিবাহ করিলে ক্যাশবাক্স কিছু ভারী হয় এমন কনে খোঁজাই ত ভাল। বিশেষত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতি ডিগ্রি অনুসারে উপার্জ্জনের ক্ষমতা ছেলেদের না বাড়িলেও ভাবি শ্বশুরের নিকট টাকা আদায়ের হুকুমনামাটা বদ্‌লাইতে থাকে ইহা একটা মস্ত সান্ত্বনার বিষয়। কোথায় কাহার কিরূপ কুরূপা কি গুণহীনা কন্যাকে বিবাহ করিলে টাকার থলি বেশ ভারী হইয়া উঠিতে পারে, রাত্রে শুইয়া শুইয়া শিবরাম তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথায় একটা ফন্দি আসিল। সকালে উঠিয়াই পকেটে একটা টাকা লইয়া সে হাঁটিয়া "অমৃতবাজার পত্রিকা" আপিসে চলিল। কাগজে 'ম্যাট্রিমোনিয়াল' কলমে বিবাহপ্রার্থীরূপে একটা বিজ্ঞাপন দিতে হইবে।

২

বিজ্ঞাপন দিয়া জবাবের আশায় শিবু প্রত্যহ ডাকের পথ চাহিয়া থাকে। এক টাকা যে মূলধন খরচ করিল তাহা কি আগাগোড়াই জলে যাইবে? দিন চারেক পরে শিবুকে আশ্বস্ত করিয়া একটি কন্যার ফোটোসমেত একখানি পত্র আসিল। শিবুর মুখে হাসি আর ধরে না। কিন্তু মাকে ও নিত্যানন্দকে কোন রকমে লুকাইয়া ব্যাপারটা না সারিতে পারিলে বিফল হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অযথা স্থানে হাসিটা

সে প্রাণপণে চাপিয়া চলিত এবং অন্নচিন্তায় আহার-নিদ্রা, বিবাহ সবই যে সে ভুলিতে বাধ্য হইতেছে মাকে ও নিতুকে দেখা হইলেই এই কথা বুঝাইত।

চিঠির যখন উত্তর আসিয়াছে তখন দেখা করিতে ত যাইতেই হইবে। শিবরাম জরুরী তলব দিয়া কাপড়-চোপড় কাচাইয়া তৈরী হইল।

ভবানীপুরের একটা গলির ভিতর বাড়ী। রাস্তার ধারে দরজা দেখিলে মনে হয় ঢুকিয়া পড়িলেই বাড়ীর সন্ধান মিলিবে। দেয়ালের গায়ে তিন চারটা পেরেক মারিয়া সাইনবোর্ড টাঙ্গানো, কিন্তু গলির ভিতর ঢুকিয়া শিবু দেখিল, প্রায় কুড়ি পঁচিশ গজ পর্য্যন্ত দরজাহীন ঘরের দেয়াল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কারাপ্রাচীরের মত দেয়াল পার হইতেই দেখা গেল, একটি কলতলা ও চৌবাচ্চা। সেখানে একটি উলঙ্গ বালক স্নানে রত। শিবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মদনবাবুর বাড়ী কোন্‌টা ?"

সে খানিকক্ষণ শিবুর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "সোজা চলে যান্।"

আরও গোটা দুই চৌবাচ্চা ও কলতলা পার হইয়া শিবু অবশেষে যেখানে পৌঁছিল সেখানে দেয়ালের গায়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটি হাত আঁকা ; হাতের নীচে কাষ্ঠ ফলকে লেখা—মেডিক্যাল কলেজের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ধাত্রী শ্রীমতী রাধাবিনোদিনী গুহ। অঙ্কিত অঙ্গুলির দিকের দরজায় ঢুকিয়া শিবু দেখিল দেড়মানুষ চওড়া খাড়া একটা সিঁড়ি। বাহিরে কি ভিতরে যাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই দেখিয়া শিবু সোজা দোতালায় উঠিয়া গেল। সিঁড়ির একপাশে বড় বড় সাদা 'চন্দ্রমল্লিকা ছাপ দেওয়া একটা লাল পর্দ্দা টাঙানো। বোঝা গেল

এদিকে প্রবেশ নিষেধ। অন্যদিকে একটি ছোট কুঠরীতে দুইখানা বেঞ্চি, একটি কাঠের চেয়ার ও একটি বেতের টেবিল অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য ধূলিধূসরিত পড়িয়া আছে। শিবু খোলা দরজার কড়াটাই সজোরে নাড়িয়া ঘরে ঢুকিয়া বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল।

দুই এক মিনিট পরে কালো ছিটের কোট গায়ে অতি ক্ষীণকায় একজন ভদ্রলোক আটহাত কালো পেড়ে ধুতি পরিয়া ঘরে আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। শিবু কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার কাঁচুমাঁচু মুখ ও নির্ব্বাক অবস্থা দেখিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনি কেসবাড়ী থেকে আস্ছেন ?" কেসবাড়ী ? শিবু আকাশ হইতে পড়িল। ভদ্রলোক বলিলেন, "ধাত্রী দরকার আছে ?" শিবুর এতক্ষণে সাইনবোর্ডের কথা মনে হইল। সে লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, আমি মদনবাবুর কাছে এসেছি। তিনি আমার বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়ে আমায় দেখা করতে বলেছিলেন।"

মদনবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "তাই নাকি ! আমিই মদনবাবু, আপনাকে চিনতে পারিনি মাপ করবেন। ভাল হয়ে বসুন, আপনি বরপক্ষের কে হন জিজ্ঞাসা করলে অপরাধ নেবেন না। ইতিপূর্ব্বে জানাশোনা নেই কি না।"

শিবু মহা ফাঁপরে পড়িল। অনেক ঘামিয়া বলিল, "আজ্ঞে আমিই বিবাহার্থী। আমার পিতার অবর্ত্তমানে আমাকে নিজেই আস্তে হল, কিছু মনে করবেন না।"

স্মিত হাস্য করিয়া মদনবাবু বলিলেন, "তা বেশ, তা বেশ। তাতে আর কি হয়েচে ? সাবালক ছেলে নিজে দেখে শুনে করাই ত ভাল। জ্ঞাতব্য যা কিছু তা আপনার কাছেই ত জানা যাবে ?"

শিবু মহোৎসাহে বলিল, "হ্যাঁ নিশ্চয়। তবে আমি দুবছর হল এম্-এ পাস করেছি, এ ছাড়া আমার সম্বন্ধে খুব আশাপ্রদ সংবাদ আর কিছু নেই। সে কথা ত বিজ্ঞাপনে আমি জানিয়েই ছিলাম।"

অতঃপর পিতার নাম, পিতামহের নাম, জাতি, কুল, দেশ, পেশা, ঘরবাড়ী, সম্পত্তি সকলের খোঁজই মদনবাবু করিলেন। কন্যাপক্ষের সকল কথা হইয়া যাইবার পর শিবুর প্রশ্নের পালা। এ সব কাজে শিবুর একেবারে কাঁচা হাত, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বলিল, "দেখুন আমি অবস্থাপন্ন লোকের একমাত্র কন্যাসন্তানকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, এ কথা বিজ্ঞাপনে আগেই লিখে দিয়েছিলাম, এখন আর জিজ্ঞাসা করা শোভা পায় না। তবু সামনাসামনি একবার জিজ্ঞাসা করছি, আপনার সন্তানসন্ততি কয়টি ?"

মদনবাবু গোঁফে একবার চাড়া দিয়া বলিলেন, "আমার সন্তান বলতে একটিমাত্র কন্যা।"

শিবু খুসী হইয়া বলিল, "অবস্থা বোধ হয় আপনার ভালই। পেশা কি ?"

মদনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বেশ খাই-দাই, সুখেসচ্ছন্দে থাকি যখন, তখন অবস্থা ভালই বলতে হবে। তবে আমার নিজস্ব পেশা ঠিক কি তা বলা কঠিন। আমার গৃহিণী ধাত্রীর কাজ করেন। তাঁরই টাকা নিয়ে আমি একটা লোন-আপিস খুলেছি, আয় মন্দ হয় না।"

সর্ব্বাঙ্গে সত্তর কি আশী ভরির নিরেট স্বর্ণালঙ্কার পরিয়া ঘন কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী একটি মহিলা সিঁড়ি দিয়া বলিতে বলিতে উঠিতেছিলেন, "হ্যাঁগা, আজ যে যুগীপাড়ার সুদ আদায়ের দিন তা কি ভুলে গিয়েছ ?"

ঘরের ভিতর শিবরামকে দেখিয়া তিনি কথার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া স্বামী ও অতিথি উভয়কেই অবজ্ঞা করিয়া পর্দ্দার অন্তরালে চলিয়া গেলেন।

শিবরাম তাঁহার দিকে তাকাইয়া মনে মনে ভাবিল, 'ধাত্রীদের অবস্থা ভালই হয় বেশ বোঝা যাচ্ছে।' মুখে বলিল, "বাড়ীঘর কিছু করেছেন?"

মদনবাবু বলিলেন, "করা ঠিক হয়নি। তবে রাস্তার ধার থেকে গলি দিয়ে আসতে আসতে যে চারটে কলতলা দেখলেন এই সারি সারি চারখানা বাড়ীই গিন্নি কিনেছেন। তিনখানা ভাড়া খাটে আর শেষটায় আমরা থাকি।"

শিবরাম অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সকলের পিছনে থাকেন, আপনার স্ত্রীর প্র্যাকটিসের ক্ষতি হয় না?"

মদনবাবু বলিলেন, "সদর রাস্তার উপরেই ত সাইনবোর্ড দিয়েছে, তাকিয়ে দেখেননি বুঝি? ক্ষতি কেন হবে? ভাড়াটেরা ত আমাদেরই দরোয়ানের মত সারাক্ষণ পথ বলে দিচ্ছে। তাছাড়া সামনের বাড়ী-গুলোতে ভাড়া বেশী পাওয়া যায়। তিনখানা বাড়ীতে মাসে দেড শ' টাকা ভাড়া।"

শিবরাম ভাবিতেছিল, কন্যা যেমনই হউক এ বিবাহ না করিয়া সে ছাড়িবে না। বসিয়া বসিয়া মাসে দেড় শ' টাকা বাড়ী ভাড়া পাওয়া কি মুখের কথা? তাহার উপর নগদ টাকা-পয়সা, থাকিবার বাড়ী, অলঙ্কার, আসবাব সবই ত আছে।

মদনবাবু হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "আপনাকে একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে।" তারপর—শিবু তাড়াতাড়ি বলিল, "আমাকে আর অত 'আপনি, আজ্ঞে' করছেন কেন? তাছাড়া—তাছাড়া—এই আমি গিয়ে আজই মেয়ে দেখে যেতে চাই।"

মদনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি একবার বাড়ীর ভেতর খোঁজ নিয়ে আসি।"

তিনি চলিয়া যাইতেই শিবুর মাথায় যত ভাবনা ভাঙিয়া পড়িল। না জানি কন্যা কেমন হইবে? সুন্দরী যদি হয় তবে সোনায় সোহাগা, আর তা যদি নিতান্তই না হয় ত মায়ের বর্ণিতা কন্যার মত ফর্সা মুখে ঠোঁটের উপর একটি মুক্তার মত দাঁত ঈষৎ দেখা যাইতেছে এমন হইলেও মন্দ হয় না। অথবা শ্যামরূপেই দুটি আয়ত চোখ ও দীর্ঘ পক্ষ্মরাজি দেখিতে কিছু অশোভন দেখায় না। খাঁড়ার মত কি বাঁশীর মত নাক না হইলেও শুধু চোখের দৃষ্টিতে সমস্ত মুখখানি অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে।

দাসীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। "এই যে এখ্খুনি আসি, মা ঠাকরুণ" বলিয়া পরদাটা পাকাইয়া উপর দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া সে ট্যাঁকে পয়সা গুঁজিতে গুঁজিতে সিঁড়ি দিয়া দৌড় দিল।

শিবরামের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। ঐ বুঝি মেয়ে আসিয়া পড়িল। যদি একেবারে হিড়িম্বা কি তাড়কার মত দেখিতে হয় তাহা হইলে কি হইবে? এত দূর অগ্রসর হইয়া না বলিবার সাহস শিবুর নাই। তাহার চেয়ে এই বেলা উঠিয়া চোঁ-চাঁ দৌড় দেওয়া ভাল। কিন্তু চারিখানা বাড়ী, একটা লোন-আপিস আর তাহাকে কে দিবে? শিবরাম দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভাবিতে লাগিল, যাইবে, কি থাকিবে।

সিঁড়ির পাশেই শাড়ীর খস্ খস্, চুড়ির রিনিঠিনি, মৃদু ভৎর্সনা শোনা যাইতে লাগিল। শিবরাম সাহসে বুক বাঁধিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

খাবারের থালা হাতে করিয়া ঝি ও রূপার পানের ডিবা হাতে মদনবাবুর কন্যার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, মদনবাবু কন্যার পাশে পাশেই

ছিলেন। শিবরাম চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। একজোড়া জরির চটি ও গোলাপী রঙের একখানা বেনারসী ছাড়া এতক্ষণ তাহার চোখে কিছুই পড়ে নাই।

মদনবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "শিবরাম বাবু, এই যে আমার কন্যা তরঙ্গিণী, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে নিয়ে এলাম।" অগত্যা শিবরাম চোখ তুলিয়া চাহিয়া নমস্কার করিল। যাক্ একেবারে তাড়কা নয়, বাঁচা গিয়াছে। কিন্তু বিধাতা বোধ হয় শিবুর মুক্তাদন্তের প্রতি পক্ষপাত জানিয়া ফেলিয়াছিলেন। তরঙ্গিণীর উপরের পাটির সব কয়টা দাঁতই নীচের ঠোঁটের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। অনেক কষ্টে দাঁত দিয়া উপরের ঠোঁট কামড়াইয়া সে তাহার মুক্তাদন্তের কিরণ আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। মেয়ের গায়ের রং একেবারে কুচকুচে কাল নয়, শ্যামবর্ণ। দেহের আয়তনে মাতার সঙ্গে কোনই সাদৃশ্য নাই, পিতার মতই ক্ষীণ দেহ।

মদনবাবু বলিলেন, "কিছু জিগ্‌গেস করুন।" শিবু সলজ্জ হাসিয়া বলিল, "আপনি কোথায় পড়েন?"

তরঙ্গিণী দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল, "বেলতলার ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি।" বলিয়াই মুখ আবার টিপিয়া বন্ধ করিল।

অতঃপর কথাবার্ত্তা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। শিবরাম বড় বড় ক্ষীরমোহন, লবঙ্গলতিকা ও 'আবার খাব' সন্দেশ খাইয়া পান চিবাইয়া যাত্রার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

কন্যা তখন অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছে। মদনবাবু বলিলেন, "একটা কিছু বলে যান।" শিবু বলিল, "মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি বিবাহের আয়োজন করতে পারেন।"

মদনবাবু হাসিয়া দুই হাত কচলাইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ;

কিন্তু আশীর্ব্বাদ-টাশীর্ব্বাদ ত আছে। আপনার মাতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে তবে আমি একবার দেখা করতে যাব।”

শিবু ব্যস্ত হইয়া বলিল, “না না, সে সবে কিছু দরকার নেই। মা আমার সেকালের তন্ত্রের মানুষ কিনা। মেয়েদের স্বাধীন জীবিকা পছন্দ করেন না। বলবেন যে, ধাত্রীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব না।”

কথাটা বলিতে শিবরামের অত্যন্তই সঙ্কোচ হইতেছিল, কিন্তু মা পাছে তাহার এমন বিবাহে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ান এই ভয়ে সে কথাটা বলিয়া ফেলিল।

মদনবাবু কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অপমান বোধ করিলেন না! বলিলেন, “হ্যাঁ, সেকালের বিধবা মানুষ, ওকথা বলতেই ত পারেন।”

গোপনেই বিবাহ হইয়া গেল। মাকে শিবু কিছুই বলে নাই। কন্যাকর্ত্তা শিবুকে হীরার আংটি, সোনার রিস্টওয়াচ, বেনারসীজোড়, রূপার বাসন কিছু দিতেই বাকি রাখিলেন না। তরঙ্গিণীরও সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। আজকালকার সোনার বাজার যে রকম গরম তাহাতে তাহার মূল্যও অন্ততঃ হাজার তিন টাকা হইবে। আসবাবপত্রও যে কিছু ছিল না তাহা নহে। শিবু মনে মনে ভাবিল, হাজার তিনেক টাকা এমন করিয়া অকারণ গহনাগাঁটিতে আটক না রাখিয়া লোন-আপিসে ইহা খাটাইলে এক বছরেই শ’চারেক টাকা লাভ হইতে পারিত। কিন্তু সে নূতন জামাই, বিবাহ-সভায় কিছু বলিতে পারে না।

বিবাহে খুব কিছু প্রাচীন রীতি মানিয়া চলা হইল না। কাজেই বিবাহ রাত্রিতেই তরঙ্গিণীর সঙ্গে শিবরাম নিভৃতে কথা বলিতে পাইল।

ঘরে যখন আর কেহ নাই, তরঙ্গিণী শ্রান্ত মাথাটা দুই হাতে ধরিয়া একটু বিশ্রামের চেষ্টা করিতেছে তখন শিবরাম যথাসাধ্য মোলায়েম ও সরস গলা করিয়া বলিল, “তরু, মার জন্যে তোমার মন

কেমন করছে? আমিত তোমাকে এখন মার কাছ থেকে নিয়ে যাব না।"

তরু একটু থামিয়া বলিল, "আমার মা কোথায় যে, মার জন্যে মন কেমন করবে?"

শিবু চক্ষু বাহির করিয়া বলিল, "কেন মদনবাবুর স্ত্রী রাধাবিনোদিনী গুহ। তুমি ত মদনবাবুরই কন্যা?"

তরঙ্গিণী বলিল, "হ্যাঁ আমি মদনবাবুর মেয়ে বটে, কিন্তু রাধাবিনোদিনী আমার সৎ মা।"

শিবুর গলা অত্যন্ত মিহি হইয়া গেল। সে মরিয়া হইয়া বলিল, "সৎমা তোমায় ভালবাসেন ত? তাঁর ত আর কোন ছেলেপিলে হয়নি শুনেছি।"

তরঙ্গিণী বলিল, "এবারে আর হয়নি বটে, আমার বাবার আমিই এক মেয়ে। কিন্তু মার প্রথম পক্ষের দুই ছেলে আছে। মা বাবা সব কথা চাপা দিয়ে বিয়ে দিলেন বলে তারা রাগ করে বিয়েতে আসেনি।"

শিবরাম দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরব হইয়া রহিল।

তরঙ্গিণী বেচারী আপনা হইতে বলিল, "আমি নিজে বাবাকে বারণ করেছিলাম। তাতে বাবা বললেন—আমি বরের সঙ্গে একটাও মিথ্যা কথা বলব না, দেব থোব খুব ভাল। তা ছাড়া পূজোর সময় এমন তত্ত্ব করব যে, দেখে জামাই খুসী না হয়ে পারবে না।"

শিবরাম ভাবিল—সত্যই ত মদনবাবু একটাও মিথ্যা কথা বলেন নাই। তাঁহার নামে মোকদ্দমা করা চলে না। তাহারই অদৃষ্টে সব মন্দ হইল। আচ্ছা, দেখা যাক লোন-আপিসে একটা চাকরী পাওয়া যায় কিনা।

উপহার

পাড়ায় বড় হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। এতগুলো বাড়ীর মাঝখানে এতগুলো মানুষের নাকের ডগার কাছে এত বড় চুরিটা হইয়া গেল! কত কালের পুরানো সব বাসিন্দা, এমন কাণ্ড ঘটিতে তাহারা জীবনে কখনও দেখে নাই। ইংরেজ কোম্পানীর আমলেও যে আবার এমন ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা কি কেহ কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিয়াছে?

অরুণাদের ত পাশেরই বাড়ি, প্রায় গায়ে গায়ে বলিলেই চলে। রাত সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত দুটো বাড়িতেই ত প্রতিদিন চলে ঝি-চাকরদের ভাত খাওয়া, মুখ ধোয়া, পান-দোক্তা চিবানো, খড়কে দিয়া দাঁত খোঁটা, তারপর বিছানা-মাদুর পাতা, গলিতে ও সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পরস্পরের কাছে সে দিন অথবা রাত্রিকার মত বিদায় লওয়া। আবার এদিকে চারটা না বাজিতেই ঝিরা আলিস্যি ভাঙিয়া হাই তুলিয়া মনিবদের গালি দিতে দিতে উঠিয়া পড়ে, কারণ দুটি বাড়িতেই কুচো-কাচা ত কম নাই; ভোর না হইতেই তাহাদের ফুড চাই, গরম জল চাই, জুটিলে দুধও চাই, মা'দের শেষ রাত্রির সুনিদ্রাটুকুও চাই। সঙ্গে সঙ্গে বামুন-ঠাকুরদেরও সুখস্বপ্ন শেষ হয়, কারণ কোথাও বা ছোটবাবু পাঁচটায় চা চান, কোথাও বা বড়বাবু সাড়ে আটটায়ই কই মাছের ঝোল, মৌরলা মাছের অম্বল, চিংড়ি মাছের কাটলেট ও ভাত না হইলে ঠাকুরের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলেন। সুতরাং মাঝখানে মাত্র সাড়ে তিনটি ঘণ্টা ত বাড়ী নিঃঝুম হয়। এরি মধ্যে এত কাণ্ড!

আহা বেচারী স্বরূপা! গহনা, কাপড়, টাকাকড়ি কিছু আর রাখে নাই। হইলই বা স্বামীর বড় চাকরি, তাই বলিয়া এত কালের এত সখের সব জিনিষ, কত টাকা তাহার পিছনে যে ঢালা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, কত জল্পনাকল্পনা, কত পাড়ায় পাড়ায় নমুনা সংগ্রহ করা, বাছিয়া বাছিয়া ভাল কারিগর আবিষ্কার করা, সখীদের হিংসা ফুটাইয়া তোলা, তিন ঘণ্টার ভিতর সব একেবারে বর্ত্তমান হইতে উবিয়া ইতিহাসের কোঠায় গিয়া ধামা চাপা পড়িল। ঘুমাইতে যখন গিয়াছিল, তখন হারার আংটি, মরকতের দুল, মুক্তার শেলী, জয়পুরী এনামেলের কণ্ঠমালা, জড়োয়া তাবিজ, সোনার সাতনর, কাশ্মীরী শাল, বেনারসী কিংখাব, এমন কি, আইরিশ ও রুশীয় সোনার ব্রোচ পর্য্যন্ত সব কিছুর অধিকার-গর্ব্বে মগ্নচৈতন্য ভরপূর করিয়া আনন্দেই চোখ বুজিয়াছিল, স্বপ্নে হয়ত আরও কত চোখ-জুড়ানো শাড়ী ও চোখ-ধাঁধানো গহনাই আলমারীর তাকে তাকে, কৌটায়, দেরাজে সাজাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ঘুম ভাঙিয়া দেখিল কিছু নাই, অরুণার মত অতসীর মত ছয়গাছা মামুলী চুড়ি ও আটপৌরে শাড়ীজামা মাত্র সম্বল। তাহাদের যদিও বা দুইচারখানা জিনিষ এ বাক্সে সে দেরাজে মিলিতে পারে, স্বরূপার তাও নাই।

সকালে উঠিয়া চা খাইবার আগেই নজর পড়িয়াছিল আলমারীর খোলা ডালা দুইটার দিকে। স্বরূপা মনে করিয়াছিল, ভুল করিয়া কাল রাত্রে বুঝি আলমারী বন্ধ না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এমন ভোলা মন ত তাহার কোনো দিন ছিল না। গহনা, কাপড় সম্বন্ধে সে চিরকালই খুব হুঁসিয়ার। কোথাও বেড়াইতে গেলে কি নিমন্ত্রণে বাহির হইলে সে দুই ঘরের তিনটা আলমারীর চাবি বারবার টানিয়া পরীক্ষা করিয়া এবং ঘরের দরজায় গা-কড়ায় তালা লাগাইয়া তবে

বাহির হয়। রাত্রি একটাতেও যদি কোনোদিন নিমন্ত্রণ হইতে ফিরে তবু গলার নেকলেস হইতে মথার কাপড়ের ছোট ব্রোচ দুটি পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি গহনা গুণিয়া আলমারীতে না বন্ধ করিয়া সে বিছানায় বসে না।

অতসীর মত আয়না-টেবিলের উপর সোনার ঘড়ি, রূপার কাঁটা, আলমারীর চাবি দিবারাত্রি ছড়াইয়া রাখা তাহার কোনো দিন অভ্যাস নাই।

অরুণাদের বাড়িভরা মানুষ, তার উপর চাকরবাকর, মুটে, পিয়ন, ফলওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, দরজি, নাপিত, বিশ্বের সব রকম ফিরিওয়ালা এবং কারিগর বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের দোতলার বারান্দায় ব্যাগ, ঝাঁকা, পুঁটলি মাথায় যখন তখন উঠিয়া পড়ে। অরুণার সব ক'টা দেরাজ আলমারী এবং ট্রাঙ্কের চাবিই সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এইজন্য সুরূপা কতদিন অরুণাকে বকিয়াছে, ঠাট্টা করিয়াছে। আর সেই সুরূপারই এমন বিস্মৃতি ঘটিল যে, গহনা কাপড়ের আলমারীর ডালা দুটা অমন ফাঁক করিয়া রাখিয়া সারারাত্রি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিল! তবু ত অরুণাদের বাড়ি টাকা-পয়সা কি গহনা চুরির কথা কখনও শোনা যায় নাই। আর বেচারী সুরূপা! চার আনা পয়সাও কখনও ভুলিয়া তালা-চাবির বাহিরে সে রাখে না; তাহারই অদৃষ্টে এমন ঘটিল!

নিজের চোখ দুটাকে তাহার নিজেরই অবিশ্বাস হইতেছিল। চোখ মুছিয়া ছুটিয়া আলমারীর কাছে গিয়া দেখিল, তাকগুলা সব একেবারে খালি। সুরূপা দুই হাত দিয়া আঁচল তুলিয়া চোখ দুটা সজোরে রগড়াইল, সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? নিজের মাথায় হাত দিল। মাথার ভিতরটা দপ দপ করিতেছে, অকারণে অকস্মাৎ সে কি পাগল হইয়া গেল? কোনো দুর্ঘটনা ঘটিল না, কোনা দুঃখকষ্ট সমস্যার

ছায়াও দেখিল না, হঠাৎ একরাত্রে একটা মানুষ পাগল হইয়া গেল ! এমন কথা ইতিপূর্ব্বে জীবনে সে কখনও শোনে নাই। সুরূপা খানিক-ক্ষণের জন্য চোখ বুজিয়া কিছু পরে আবার তাকাইল। আলমারী তেমনি শূন্য, আবার লোহার সিঁড়ির পাশের দরজাটাও খোলা।

চুরি। এই বুঝি চুরি ? সর্ব্বস্ব এমন করিয়া ঘরের ভিতর হইতে চলিয়া যাইতে পারে, সে ঘরের ভিতরে থাকিতেই, এ অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। এ কল্পনাও সে কোনোদিন করে নাই। চুরির ভয়ে সাবধানতার অন্ত তাহার ছিল না। সেই সমস্ত সাবধানতাকে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া কোন্ যাদুকর এমন করিয়া তাহাকে ভিখারী সাজাইয়া দিল ভাবিয়া সুরূপা থই পাইতেছিল না। এ যেন একেবারে আরব্য উপন্যাসের যুগ ; আলাদীনের দৈত্য আসিয়া তাহার গর্ব্ব, যত্ন ও মমতায় ঘেরা সমস্ত ঐশ্বর্য্য কোন্ লোভীর লোভ মিটাইতে নিঃশেষ করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি সুরূপার ছিল না। কিন্তু তাহাকে উঠিতেই হইল। এ-বাড়ীতে তাহার ভাসুর অনুরূপবাবু এবং ও-বাড়ীতে বড় মেজ-সেজ যতগুলি বাবু ছিলেন সকলেই শুনিলেন যে, সুরূপার ঘরে এই রকম অদ্ভুত চুরি হইয়া গিয়াছে। বাবুরা প্রায় সমস্বরে হাঁকিয়া উঠিলেন। এক মুহূর্ত্তে দোতালার ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি, সদর দরজা এবং ফুটপাথ কৌতূহলী লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। পাশের বাড়ীর ছাদে, জানালায়, বারান্দায় সর্ব্বত্র কেবল বিস্ময় ও কৌতূহল-বিস্ফারিত চোখ জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। কোনোখানে লুকাইয়া পড়িয়া শোক করিবার জায়গা সুরূপার ছিল না। তবু সে তাহারই মধ্যে ঘরের এক পাশে একটা চেয়ারে সাধ্যমত চুপ করিয়াই বসিয়াছিল। লোকের খোঁচায় কথার জবাব দু-একটা করিয়া তাহাকে

দিতেই হইতেছিল। কারণ মানুষ ত কেবল সুরূপার রিক্ত মূর্ত্তি ও শূন্য আলমারীটা দেখিতে আসে নাই। তাহারা এই বৈচিত্র্যহীন জগতে নূতন একটা গল্পের সন্ধানেই বেশী করিয়া আসিয়াছিল। বড় রকম একটা ডিটেক্‌টিভ গল্প এখনি শুনিতে পাইলে সকলেই খুশী হইত। কিন্তু চুরি ধরা পড়ামাত্রই গল্পটা বাঁধিয়া উঠে না এবং হৃতসর্ব্বস্ব মানুষের গল্প বানাইবার ইচ্ছা বা শক্তিও থাকে না, ইহা তাহাদের বুঝাইয়া দিবার লোক ছিল না এই যা দুঃখ।

তবু অতসী একবার বিরক্ত হইয়া বলিল, "আরে বাপু, চুরি কেমন করে হ'ল, এত জিনিষ কি করে নিলে সবই যদি চোরে লিখে দিয়ে যাবে তবে পৃথিবীতে পুলিশ পেয়াদা আছে কি করতে?"

একজন বলিল, "আহা, তবুত কিছু জানা যায়! বাড়ীতে কেউ চোরটোর ছিল?

অতসী বলিল, "এতগুলো মানুষের মধ্যে কে যে চোর ছিল আমাকে ত কেউ বলেনি; তাহলে চুরি হবার আগেই তাকে জেলে পূরে রাখ্‌তাম।"

অনুরূপবাবু বলিলেন, 'বৃথা বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করে কি হবে? যাই পুলিশে খবর দিয়ে আসি গে। এ ঘরের কোনো জিনিষ কেউ নাড়াচাড়া করে না যেন। দরজা-জানালা যেটা যেমন খোলা কি বন্ধ ছিল পুলিশে ঠিক তেমনি সব দেখ্‌তে চাইবে। সুতরাং সেখানেও কেউ হাত দিতে যেও না।"

জন কয়েক লাল পাগ্‌ড়ী পাহারাওয়ালা সঙ্গে করিয়া বাঙালী এক ইনস্পেক্টর আসিয়া হাজির হইলেন। দেখিয়াই অনেক লোক পলায়ন করিল। কেহ সাক্ষ্য দিবার ভয়ে দৌড়, কেউ বা ধরাপড়ার ভয়ে। ইনস্পেক্টরবাবু একলাই তিনটা মানুষের সমান মোটা, গাড়ীর যে সিটটিতে বসিয়াছিলেন সেটা প্রায় সবটাই ভরিয়া গিয়াছিল। অনেক

কষ্টে কনষ্টেবলদের হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িলেন। ডাক পড়িল বাড়ীর সব চাকরবাকরদের। চাকর, বেহারা, উড়ে বামুন, ঝি, দারোয়ান কেহ বাদ গেল না। দারোগাবাবু বিপুল দেহ নাড়া দিয়া গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, "কিহে, দলে কে কে ছিলে বল না! কত করে বখরা ঠিক হয়েছে?" ভৃত্যবর্গ নুইয়া পড়িয়া জোড়হস্তে বলিল, "আজ্ঞে,—আজ্ঞে, আমরা ত কিছুই জানি না। আমরা নিমকের গোলাম।" ঝিরা সকলে এক গলা করিয়া ঘোমটা টানিয়া এ উহার গায়ের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। পাশের বাড়ীর একটা নিতান্ত ছোকরা চাকর একবার একটা পার্কার ফাউনটেন পেন চুরি করিয়া এক টাকায় বিক্রী করিতে গিয়া পুলিশের চড়-চাপড় কয়েকটা খাইয়া আসিয়াছিল। ভীড়ের ভিতর তাহাকে উঁকি মারিতে দেখিয়া একটা কনষ্টেবল তাহার কান ধরিয়া টানিয়া আনিল! ভয়ে বেচারীর কাল মুখ ছাইয়ের মত শাদা হইয়া গিয়াছে। দারোগা টিটকারী দিয়া বলিল, "কি হে ব্যবসাদার, তোমার ত চোরদের সঙ্গে কারবার আছে, কে কে ঢুকেছিল বল দেখি!" ছেলেটা ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অনুরূপবাবু বলিলেন, "ওকে ছেড়ে দিন মশায়, ও নেহাৎ কচি ছেলে। এ সব কাণ্ডয় এগোবে এত বড় বুকের পাটা ওর নেই।"

দারোগা বলিল, "তবে আপনারা কাকে কাকে সন্দেহ করেন বলুন।"

অনুরূপ বলিলেন, "সন্দেহ যদি আমরাই করব তবে আপনাদের ডাক্‌লাম কেন? আমরা কাউকে সন্দেহ করি না। তবে আপনারা চারিদিক দেখে শুনে জেরা করে কিছু যদি বার করতে পারেন সে আপনাদের কৃতিত্ব।"

চাকরদের বাক্স-পেঁটরা তল্লাস হইল, তাদের বহু গালাগালি এবং দু-চারটা রুলের গুঁতোও দেওয়া হইল, বাড়ী ঘিরিয়া নানা জায়গায়

নানা রকম চিহ্ন দেওয়া এবং খাতায় নক্সা ও নোট লওয়া হইল, কিন্তু কূলকিনারা কিছু হইবে বলিয়া মনে হইল না। দারোগা বলিলেন, "জিনিষপত্রের দুটো ফর্দ্দ করুন, একটা আমার চাই আর একটা আপনারা রেখে দেবেন। আজ রাতে ঘরটা অন্ধকার করে যেখানে যেমন তেমনি রেখে দেবেন। কাল একবার এসে সব ভাল করে দেখে পথ-ঘাট সিঁড়ি, গলি সব বুঝে নেওয়া যাবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, আলমারীর গা-কলটা খুলে নিয়ে যেতে চাই; কি রকম করে ওটা ভাঙা হয়েছে দেখ্‌তে হবে।"

অনুরূপ বলিলেন, আচ্ছা, আপনারা একটু বসুন, ফর্দ্দটর্দ্দ সব তৈরি করে দিচ্ছি।"

একটা পাহারাওয়ালা বলিল, "বাবুজি, বহুত হয়রানি হুয়া, থোড়া পান তামাকু মিল যানেসে…" সঙ্গে সঙ্গে সব কয়জনই দন্তবিকশিত করিয়া বাবুর মুখের দিকে তাকাইল।

অনুরূপ অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এতটাকা যখন গেল, তখন তোমাদের লোভটুকুর উপর রাগ করে আর কি হবে?"—এই নাও বাপু পান কিনে আন" বলিয়া তিনি পকেট হইতে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

* * *

স্বরূপা অন্দরের দিকের সরু বারান্দাতে বসিয়া মায়ের কোলের মেয়েটির সঙ্গে কথা বলিয়া মনটা একটু স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রথম যৌবনে তাহার কোলেও এমনি একটি পুষ্পপেলব শিশু আসিয়াছিল, সে আজ প্রায় এক যুগ আগের কথা। তখন অলঙ্কারের ভারের চেয়ে তাহার কচি হাতের মধুর স্পর্শই স্বরূপার অঙ্গে অধিক আনন্দের শিহরণ জাগাইত। সে শিশুর উজ্জ্বল চোখের হাসিভরা দৃষ্টির কাছে

হীরার কণ্ঠির দ্যুতি কোথায় লাগে? কিন্তু সে হাসির আলো ত ধরিয়া রাখা গেল না। বছর দশ হইয়া গেল তাহার সে নন্দিনী মার ঘর অন্ধকার করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর বহু রত্নমাণিক্যের চমক এ ঘরে দেখা দিয়াছে, কিন্তু শিশু-নয়নের প্রদীপ জ্বালিতে তাহার কোলে আর কেহ আসে নাই। সোনারূপা, হীরা, জহরতের আলোও কে এক ঘায়ে নিবাইয়া দিল। সুরূপার আর চোখ মেলিয়া এই বর্ণহীন পৃথিবীর দিকে তাকাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কে যেন একটা কালীর প্রলেপ দিয়া সমস্ত পৃথিবীটাই ধোঁয়াটে করিয়া দিয়াছে। কেবল ছোট শিশুদের মুখের হাসি মাঝে মাঝে জোনাকীর আলোর মত অন্ধকারের গায়ে ফুটিয়া উঠিতেছে। আজ মনে পড়িতেছে বারো বৎসর আগের সেই হাসির ঝরণাধারা; কিন্তু পরের মেয়ের মুখের হাসিতে সে দীপ্তি দেখিবার শক্তি তাহার নাই। মন খুশী হইতে পারিতেছে কই? এ হাসি দেখিয়া কেন শ্রান্তি দূর হয় না?

হঠাৎ আসিয়া অনুরূপ বলিলেন, "বৌমা, তোমার গয়নাগাঁটি, জিনিষপত্র সব কিছুর একটা ফর্দ্দ দিতে হবে, ওদের দরকার আছে। তোমার মনে আছে ত?"

হায় ভগবান! মনে আবার নাই? এই গহনাকাপড় সোনারূপার মধ্যেই ত সে এতকাল বাঁচিয়াছিল। এই কাপড়গুলির প্রত্যেকটি ভাঁজ তাহার পরিচিত ছিল। অপরে পাট করিয়া গুছাইয়া রাখিলে তাহার পছন্দ হইত না। কেমন যেন এলোমেলো ভাঁজ পড়িয়াছে, তাহার প্রিয় হস্তের সেবা না পাইলে তাহারা ঠিক মত পাটে পাটে বসিবে না। সুরূপা আবার সব খুলিয়া সস্নেহ স্পর্শে তাহাদের যথাযথভাবে যথাস্থানে সাজাইয়া তবে স্বস্তি বোধ করিত। ইহারা কে কবে কোন্ ক্ষণে কোন পথে কেমন করিয়া তাহার হাতে তাহার দরবারে

আসিয়াছে, তারপর কবে কোথায় কখন তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য তাহার সঙ্গ লইয়া কত উৎসবে কত আনন্দে কতবার ঘুরিয়াছে তাও যে আজ ছবির মালার মত পরে পরে মনে আসিতেছে।

প্রথম দিন হইতে সব কথাই ত স্পষ্ট মনে পড়ে। যখন সে সাত বছরের মেয়ে তখন স্বরূপার মা তাহাকে সরু সরু ছয়গাছা অমৃতী পাকের চুড়ি পাশের বামন বাড়ীর মেয়ের হাত হইতে খুলিয়া কিনিয়া দিয়াছিলেন। চুড়ি খুলিতে মেয়েটির হাতের মুঠির দুই পাশে গামছা বাঁধিতে হইয়াছিল, তাতেও বেচারীর হাত ছড়িয়া রক্ত পড়িয়াছিল এ কথা স্বরূপার আজও বেশ মনে আছে। রাত্রে এলোমেলো শুইয়া ছয় মাসেই সে ছয়গাছা চুড়ি যে সে বাঁকাচোরা করিয়া শেষে ভাঙিয়া বারো টুকরা করিয়া ফেলিয়াছিল তাহাও এ পর্য্যন্ত ভুলে নাই। আজও যেন দেখিতে পাইতেছে মার মুখ। এক গাছা করিয়া চুড়ি ভাঙে আর মা চোখ রাঙাইয়া বলেন, "ভাঙ্‌লি আবার এক গাছা, কি অলক্ষ্মী মেয়ে, বাবা!" সেই বারো টুকরা চুড়ি দিয়া পরের বছর মা তাহাকে বাঁশ প্যাটার্ণ বালা গড়াইয়া দিয়াছিলেন। 'ও মেয়ের যুগ্যি বাঁশ ছাড়া আর কি হবে' বলিয়া। বালা জোড়া পরশুও স্বরূপা একবার খুলিয়া দেখিয়াছিল। বারো বৎসর বয়সে একবার কলতলায় পড়িয়া গিয়া বাঁ হাতের বালাটা টোল খাইয়া গিয়াছিল, আজ ষোল বৎসর তাহা তেমনি ছিল, সারিতে দিলেই স্যাকরারা ভাঙিতে চায়, তাই আর সারা হয় নাই।

ছেলেবেলায় ব্রোচ কাহাকে বলে, দুলই বা কি, এসব স্বরূপা জানিত না। মা ছিলেন সেকেলে মানুষ। ইহুদী মাকড়ী আর পালিশ পাতের ফুল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। কিন্তু মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হইতেই মেয়ের দৃষ্টি খুলিয়া গেল। সহপাঠিনীরা কত রকম সব সৌখীন

গহনা পরিয়া আসে। সুরূপা বেচারী টিনের রঙকরা ফুল-বসানো ব্রোচ ইস্কুলে ফিরিওয়ালার কাছে কিনিয়া কোন রকমে আধুনিক পোষাকের মর্য্যাদা রক্ষা করে। তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া বাবা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বড় একটা গহনার দোকানে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে সেদিন জীবনে সেই প্রথম অত ঝল্‌মলে গহনার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে যে কেমন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল কোনো দিন তাহা ভুলিবে না। মনটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল হাজারটার উপর। অথচ বাবা বলিলেন, "এক একটা বেছে নাও।" বাছিতে কি পারা যায়? কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টা লইবে সে? অগত্যা বাবাই বাছিয়া দিলেন। কাঁধের জন্য একটা সোনার ডাঁটিতে বসানো একটি সোনার মৌমাছি, গলায় মুক্তা-বসানো ধুক্‌ধুকি দেওয়া ছোট একটি বিছা চেন, কানে মুক্তা দুলানো দুল। দোকানে দাঁড়াইয়া এই সামান্য কয়টা গহনা তাহার মনে লাগে নাই। যেন না লইলেই ইহার চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু বাড়ি আসিয়া সেগুলির রূপ ও মূল্য সহস্রগুণ বাড়িয়া গেল। ওই মৌমাছির চোখের দুটি পাথর তখন দোকানের সব হীরা-মোতির অপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাওয়ায় কাঁপা মৌমাছির সোনার শুড় দুটি যেন কারিগরের নৈপুণ্যের পরম নিদর্শন। বড়-বয়সে-পাওয়া কত সক্ষম শিল্পের বহুমূল্য কাজ তাহার মনে এই শুঁড় দুটির দেওয়া আনন্দের কণা-পরিমাণ আনন্দও সঞ্চার করিতে পারে নাই।

তারপর দিনে দিনে তাহার রত্ন-ভাণ্ডারে কত ছোটবড় রত্নই আহরিত ও সঞ্চিত হইয়াছে। সে সবের ইতিহাস ঘিরিয়াই তাহার জীবনের ইতিহাস। জীবনে যত মানুষের স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব সে পাইয়াছে, সকলেই যেন সে ভালবাসার আলো সোনারূপার বন্ধনে

বাঁধিয়া তাহার মণিকোঠায় বন্দী করিয়া দিয়া গিয়াছিল। যত বিশেষ দিনের বিশেষ আনন্দ সবই এক একটি স্বর্ণসূত্র ধরিয়া তাহার মনে আসিয়া একটা বাসা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। যে-স্মৃতির সহিত অলঙ্কার জড়িত নাই তাহাকেও সে আর কোনো পার্থিব রূপ দিয়াই ধরিয়া রাখিয়াছিল। কত শাড়ী, কত জরি, কত রূপা-পিতলের কারুকার্য্য সবই এখানে নানা স্মৃতির মূর্ত্তি ধরিয়া পাশাপাশি দিন কাটাইয়াছিল। তাহারা আজ সকলে এক সঙ্গেই বিদায় লইয়াছে।

বিবাহের দিনের যত সুখস্মৃতি, মা-বাবা, ভাই-বোন, মাসি-পিসি আত্মীয়বন্ধু সকলের মুখ সকলের আশীর্ব্বাদ, তাহা সবই তাহার ওই হীরার কণ্ঠী, মুক্তার চূড়, সোনার তাবিজ, ঝাপটা, ঝুমকো, সিঁথির সহিত সে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। হয়ত আশীর্ব্বাদের চেয়ে গহনার অস্তিত্বটাই অনেক সময় বড় হইয়া উঠিত! কিন্তু তবু শুধু গহনা, শুধু ঐশ্বর্য্যের একটা মাপ বলিয়াই সে ওগুলিকে দেখে নাই। তাঁহাদের অমূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ উহাদেরই ভিতর মূর্ত্তি ধরিয়া আছে এমনি একটা বিশ্বাস তাহার মনে গাঁথা ছিল। ওই ছোট বড় গহনার কোনোটিকে সে বদলায় নাই, ভাঙে নাই বা বেচে নাই। মনের মত হউক না হউক, যেটি যেমন ছিল ঠিক তেমনিই সে রাখিয়াছিল।

স্বামীর প্রথম যৌবনের ভালবাসার একটা নেশা ছিল স্ত্রীকে এমন কাপড়, এমন গহনা প্রত্যেক স্মরণীয় দিনে দিবে যাহা আশেপাশের বাড়ির কোন বউ-ঝি কখনও পরে নাই। কোথা হইতে সে নমুনা সংগ্রহ করিত, কোথা হইতে গড়াইত তাহা কাহাকেও জানিতে দিত না, এমন কি সুরূপাকেও না; পাছে আর কেহ নকল করিয়া বসে। ইহা ছিল সুরূপার স্বামীর একটা পরম গর্ব্ব ও অহঙ্কারের বিষয়। কেহ নমুনা চাহিলে সুরূপা বলিত, "উনি বড় রাগ করবেন ভাই,

তোমরা এইখানে দেখে যা পার করিয়ে নিয়ো।" মেয়েরা আড়ালে বলিত, "বাবা এত দেমাক্ আবার ভাল না। আমরা কি আর মানুষ নয়, না আমাদের গায়ে ওঁর অমরাবতীর অলঙ্কার উঠ্‌লে কিছু মহাপাপ হয়ে যাবে ?"

ছোটবড়, নূতন-পুরাতন, ভাঙা-ছেঁড়া প্রতিটি জিনিষের স্মৃতির ভিতর হইতে কত বিগত দিনের সুখ-শিহরণ যেন বাহির হইয়া আসিয়া সুরূপাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। আজ এক দিনে সে জীবনের বিশ একুশ বছরের সুখ সৌভাগ্যের তীর্থগুলির উপর চোখ বুলাইয়া আসিল। সে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আসিবার আলোকগুলি তাহার চিরদিনের মতই নিবিয়া গেল কি-না কে জানে ?

পুলিসের লোক গহনা, কাপড়, রূপার বাসন ইত্যাদির ফর্দ্দ লইয়া এবং আর একটা ফর্দ্দে সহি দিয়া চলিয়া গেল।

* * *

সুরূপার স্বামী বাড়ি ছিলেন না। ছুটিতে বিদেশে গিয়াছিলেন, কাজও ছিল এবং বেড়ানরও সখ। এমন অবস্থায় স্বামীকে এই দুঃসংবাদটা দিবার তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। বাড়িতে ফিরিয়া যা হইয়াছে সবই ত দেখিবেন, মিথ্যা আগে হইতে মানুষকে কষ্ট দিয়া লাভ কি ?

পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। অরুণা বলিল, "ভাই, পাঁচ ছ'দিন ত হয়ে গেল। এখনও কোন কূলকিনারা হ'ল না। বছরকার দিনে এয়োস্ত্রী মানুষ এমনিধারা করে মানুষের সামনে কি করে বেরোবি ? খবর দে না সেখানে একটু, যেন সব দিক সাজিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে।"

সুরূপা বলিল, "সে হয় না, ভাই। রেখেঢেকে আমি লিখ্‌তে

জানি না, কিছু লিখ্‌তে গেলেই আমার সব বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে ওদিক্ দিয়ে আমার না যাওয়াই ভাল। প্রতিবারই ত কিছু আসে, তাইতেই আমার চল্‌বে। আর যদি নিতান্ত বিধাতা সদয় হন ত সবই ফিরে পাব।”

বড়-মা হাসিয়া বলিলেন, “বাবা, তুই এখনও আশা রাখিস্? আমার ত একটা আধলা হারালেও কখন ফিরে পাই না।”

অরুণা বলিলন, “আধলা সহজেই পাওয়া যায়, কিন্তু সোনাদানা লক্ষ্মী, গেরস্তর হারাতে নেই। আমি রেলগাড়ীতে অচেনা ট্যাক্সিতে জিনিষ হারিয়েও পেয়েছি।”

বড়-মা বলিলেন, “কিসে আর কিসে? গলাটা কাটেনি এই চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি, আবার জিনিষ ফিরে পাবে! একেবারে সাক্ষাৎ ডাকাতি, একে কি হারানো বলে?”

সাত দিনের দিন পুলিস হইতে খবর আসিল কতক চোরাই মাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের জিনিষের সহিত মিলে কিনা দেখিয়া যাইতে হইবে।

সুরূপার বড়-মা গলায় আঁচল দিয়া জোড়হস্তে মা দুর্গাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, “হে মা দুর্গা, জোড়াপাঁঠা দেব মা, এ যাত্রা যেন সফল হয়।” সুরূপা মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে মানত করিল যদি সব ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে গায়ে যৎসামান্য যা অলঙ্কার আছে তা মা’র পূজায় ব্যয় করিবে।

অনুরূপবাবু বাড়ীর একটি বৃদ্ধা আত্মীয়াকে সঙ্গে করিয়া রওনা হইলেন। সুরূপা ত থানায় যাইবে না, কাজেই গহনা দেখিয়া চিনিতে পারিবে এমন একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকা চাই। সুরূপা এই বুড়ী পিসিমাকেই প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল।

গহনা বাহির হইল, হিন্দুস্থানী ঢঙের রূপার পৈঁছা, সোনার ফাঁদ নথুনি, নাকের বেশর, পায়ের গোছাভরা মল ইত্যাদি। দেখিয়া পিসিমা, 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, "মাগো মা, কোন্ মেড়োনির গায়ের তেলকালীমাখা যত গয়না ঘাঁট্তে আমায় টেনে নিয়ে এলে ?"

দ্বিতীয় আর একদিন অনুরূপ একা আসিয়া কোন একটি সাত বছরের খুকীর কোমরের বিছা, হাতের রুলি ও মাথার ফুলচিরুণী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গেলেন।

যাক্, আশা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। যা গিয়াছে তাহার মায়া করিয়া আর কি হইবে ?

*　　*　　*　　*

স্বরূপা বসিয়া পূজার দিন গুণিতেছিল আর ভাবিতেছিল, এবার কিছু একটা ছুতা করিয়া সে পূজার কয়দিন গেঁয়োখালিতে তাহার খুড়তুতো বোনের বাড়ি কাটাইয়া আসিবে। তাহা হইলে নিরাভরণ বেশে আর দশজনের চোখের সম্মুখে তাহাকে পড়িতে হইবে না।

ছোট একটি ছেলে একখানা চিঠি হাতে আর তিন চারজনের আগে আগে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, "কাকীমা, তোমার চিঠি। আমি সকলের আগে এনেছি।"

বাকি কয়জন চীৎকার করিয়া উঠিল, 'আমিও দেব।'

সকলের হাতে চিঠিখানা একবার করিয়া দিতে হইল। প্রত্যেকেই 'এই নাও' বলিয়া স্বরূপাকে ফিরাইয়া দিল। সকলেরই দেওয়া হইল।

ছেলেদের খেলা এক মুহূর্ত্তেই শেষ হইয়া গেল। তাহারা আবার নূতন একটা কিছুর অন্বেষণে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুরূপার স্বামী লিখিয়াছেন, "এবার পূজোয় কি উপহার বল দেখি? তুমি কিছুতেই বল্‌তে পারবে না। তোমার হীরার নেকলেসের সঙ্গে মানাবে, রুবির চুড়ির সঙ্গেও মানাবে, পান্নার দুলের সঙ্গেও বেমানান হবে না। এমন জিনিষ ভাব্‌তে পার? কত তার দাম পড়েছে বল্‌ব না। কিন্তু তুমি একদিন বল্‌বে তোমার সমস্ত গহনার মোট দামের চেয়েও তার দাম বেশী। কাল সকালে তুমি সেটি পাবে।"

সুরূপা ভাবিল, অতি তুচ্ছ উপহারের দামও ত এখন তাহার সমস্ত অলঙ্কারের চেয়ে বেশী। কিন্তু স্বামী ত তা জানেন না। তবে কি মহামূল্য রত্ন তাহার জন্য আসিল? স্বামী কি সন্ধান করিয়া সমস্ত অলঙ্কার উদ্ধার করিয়া পাঠাইয়াছেন? তাহা কি একেবারেই অসম্ভব? তবে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমা বলিতে হইবে। একটা তিরস্কার নাই, অনুযোগ নাই, উপদেশ নাই, কেবল সাদর উপহারের অর্ঘ্য। সুরূপা চিঠির কথা কাহাকেও কিছু বলিল না।

পরদিন সকালেই বাহির বাড়িতে একটা গোলমাল শোনা গেল। কি একটা জিনিষ লইয়া চাকর-বাকর সবাই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। একজন বলিতেছে "ওরে, ছোটবৌমাকে আগে খবর দে।" আর একজন বলিতেছে, "সাত তাড়াতাড়ি যেখানে-সেখানে টেনে তুলিস্ না। ও সব জিনিষের তোরা কি বুঝিস্? বড়বাবুকেই না হয় বল্।" দরোয়ান বলিল, "ইয়ে লোগ বহুত চিল্লাতা হ্যায়, জল্‌দি করনা চাহি।"

সুরূপা গোলমাল শুনিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দা হইতে ঝুঁকিয়া দেখিতে গেল। নিশ্চয় কোনো বড় মণিকার কি স্বর্ণকার লোক সঙ্গে আসিয়াছে তাহাব স্বামীর বহুমূল্য উপহার সরবরাহ করিতে। বোকা চাকরেরা তাই লইয়া হট্টগোল বাধাইয়া দিয়াছে। বৌমাকে ডাকা

উচিত কি বাবুকে তাহা স্থির করিতেই কলহ বাধিয়া গিয়াছে। স্বরূপা নিজেই জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে, এত চেঁচামেচি কিসের ?"

লাখুয়া বলিল, "এই যে মা, এই এরা বড় গোলমাল করছে। কি কোম্পানী থেকে যেন লোক এসেছে। বাবু না-কি ওদের বাক্স নিয়ে আস্‌তে বলেছিলেন।"

স্বরূপা বলিল, "বাক্স আবার কিসের ?"

একটা নীলকুর্ত্তা পরা কুলী হাসিয়া বলিল, "বহুত ভারি বাকস্ মাজি, গহনা কো বাকস্।"

স্বরূপা বিস্মিত হইয়া ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল। আর একটা লোক বোধ হয় চাপরাশি, তাহার হাতে একটা জিনিষ সরবরাহের ছাপা কাগজ দিল—গডরাজ কোম্পানীর একটি লোহার সিন্ধুক,—নিরাপদে গহনা রাখিবার জন্য। সিন্ধুকটি ছোট, দেয়াল কাটীয়া সেখানে বসাইয়া দিলে আর কাহারও সাধ্য নাই কিছু করে।

পথবাসিনী

বর্ষার দিনে হঠাৎ জ্বরে পড়িলাম। সারাদিনই বিছানায় একটানা শুইয়া থাকিতে হয়। দক্ষিণ দিকের জানালাটা দিয়া বাহিরের পৃথিবীর হরিৎ রূপ অনেকখানি চোখে পড়ে তাই রক্ষা, না হইলে সারা দিন কড়িকাঠ গোনা ছাড়া উপায় ছিল না।

বালিশে মাথা দিয়াই দেখিতে পাই ঘনমেঘভারানত আকাশের নীচে বর্ষাস্নাত তাল ও নারিকেল গাছের কণ্টকিত মাথাগুলি হাওয়ায় কেবলই দুলিতেছে। পথের ধারের সারি সারি কৃষ্ণচূড়ায় বসন্তে যে অগ্নিবরণ আবীর ছড়াইয়া ছিল আজ তাহা বর্ষার স্নানে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, গাছগুলিয় পত্রবহুল শ্যামশ্রীর স্নিগ্ধতা চোখ জুড়াইয়া দিতেছে। পাড়াটা নূতন, কাজেই জনাকীর্ণ ঘরবাড়ীর চেয়ে পোড়ো জমিই এখানে বেশী। মাথাটা তুলিয়া মাঝে মাঝে দেখিতাম, পোড়ো জমির চূণ-সুরকী, আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা সবই নব তৃণদলের স্বর্ণাভ সবুজ আস্তরণে ঢাকা পড়িয়া যেন কয়দিনে হঠাৎ নন্দনকানন হইয়া উঠিয়াছে। এখানে-ওখানে ঘন কচুবন ; মসৃণ কচুপাতার উপর বড় বড় জলের ফোঁটা নিটোল মুক্তার মত টলটল করে। একটু হাওয়ার দোলায় ভাঙিয়া বীজ মুক্তার মত গড়াইয়া পড়িয়া যায় দেখিয়া মনে হইত কবিরা পদ্মপত্রের জল দেখিয়া এত কবিতা লিখিলেন, কিন্তু ঘরের পাশে ছাই গাদার উপর কচুর পাতায় পাতায় এমন শতশত মুক্তারত্ন কাহারও চোখে পড়িল না কেন ?

ঘরে একলা শুইয়া শুইয়া পথের ধারের মানুষগুলার সঙ্গেও পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। সকাল হইলেই টাকপড়া বুড়া রহমান তার নাতিটিকে

কোলে করিয়া ফুটপাথে টাটকা মাছের খোঁজ করিতে আসে। তখন ভাল মাছের ঝাকাটা দেখিয়া পড়শীরা সব কিনিয়া লইবে এই ভয়! যতই কেন-না সে পুরানো খরিদ্দার হউক মেছুনীরা তাহার জন্য এক পোয়া ভাল মাছ কখনই আলাদা করিয়া সরাইয়া রাখিবে না।

দুপুরে গাছতলায় সেই আমাদের সুকৃষ্ণবরণা ভীমকায়া ফেরিওয়ালী রক্তবস্ত্র পরিয়া আমের ঝোড়া লইয়া বিশ্রাম করিতে বসিত। সকালে যা বিক্রী হইয়াছে তাহার পর আর খুব বিক্রীর আশা নাই; এদিকে পেটেও ক্ষুধার আগুন জ্বলিয়াছে। কাজেই ঝুড়ির যতগুলা সম্ভব আম সে একলাই খাইয়া শেষ করিত। পাড়ার ছেলেমেয়েদের দেখিলে দুই-একটা দিতে তাহার কখনও ভুল হইত না! বিশেষ ওই যে ছেলেটা চৌখুপি লুঙ্গি পরিয়া ডোবা হইতে হাঁসের পাল তাড়াইয়া রোজ এই পথে বাড়ি ফিরিত, উহার ভাগ্যে রোজ দুটা আম লেখাই ছিল।

বিকালে বুড়া স্কট সাহেব তাহার লম্বা গলার ডগায় বসানো দুর্ব্বল মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে ছোট চামড়ার ব্যাগ হাতে ঠিক চারটায় আপিস হইতে বাড়ি ফিরিত। একটু পরেই ছোকরা হড্‌সন সাহেব তাহার চারিটা অতিকায় গ্রে-হাউণ্ড কুকুর লইয়া হাত-কাটা সাদা কুর্ত্তা পরিয়া বাহির হইত হাওয়া খাইতে। সন্ধ্যায় দেখিতাম তরুণী এমির সহিত পালা করিয়া তাহার দুই যুবকবন্ধুর প্রেমলীলা।

সেদিন সকালে দেখিলাম আমাদের আমওয়ালীর বিশ্রামকুঞ্জে ভোর হইতেই নূতন কে আস্তানা গাড়িয়াছে। ওই কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় মাঝে মাঝে ফুলুরিওয়ালারা লোহার উনান-কড়া-খুন্তি লইয়া দোকান খুলিয়া বসে বটে। তাই হয়ত হইবে। বিছানা হইতে মাথাটা তুলিয়া দেখিলাম পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। তিনখানা ইট পাতিয়া মাটির

হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়াছে। কাগজ, খড়, শুক্‌না পাতা এইসব তাহার উনানের ইন্ধন। ফুটপাথের কলে গোটা দুই এনামেলের থালা, একটা কাচের গেলাস, একটা এলুমিনিয়মের বাটি, একটা ছোট গামলা মাজিয়া ধুইয়া জল ভরিয়া সে উনানের পাশে আনিয়া রাখিল। ভাত নামিল, তারপর ডাল চড়িল। বিস্কুটের টিনের ভিতর হইতে মাল-মশলা বাহির করিয়া পানও সাজিল। সঙ্গে একটা গামছা-বাঁধা পুঁটুলীতে খান-চারেক কাপড়, দুখানা কাঁথা—খুলিয়া মাঠের উপরেই রৌদ্রে শুকাইতে দিল। এ যে রীতিমত সংসার! কিন্তু মানুষটা একেবারেই একা। নিঃসঙ্গ আসিয়া পথে ঘরকন্না সাজাইয়া বসিল এ কে? কোথাও দূর পথে যাইতেছে বোধ হয়। কিন্তু কলিকাতায় ট্রাম আর মোটর বাসের রাজ্যে এমন চাল-চিঁড়া বাঁধিয়া গ্রাম্য চালে মানুষ ত পথ চলে না।

দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়া যখন উঠিয়া বার্লির জল খাইতে বসিয়াছি, দেখি মেয়েটি গাছতলায় পা ছড়াইয়া দীর্ঘ চুলে বিলি দিয়া চুল শুকাইতেছে। এই গাছতলার ঘরকন্না ছাড়িয়া এখনই চট করিয়া সে কোথাও রওনা হইবে বলিয়া ত মনে হইল না। বেশ শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব, যেন গৃহকর্ত্রী সারাদিনের কর্ম্মশেষে অপরাহ্নে অন্দরের ছাদের শেষ রোদটুকু একটু উপভোগ করিয়া লইতেছেন। পথচারীরা একটু কৌতূহলের সহিত তাহার দিকে দেখিয়া গেল, কিন্তু কেহ দাঁড়াইল না। সেও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিল না। চুলগুলা হাতে জড়াইয়া শক্ত করিয়া একটা খোঁপা বাঁধিয়া কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা নামাইয়া মাঠে বিছানো কাপড়, কাঁথাগুলা এক এক করিয়া তুলিয়া পাট করিতে লাগিল। কাপড় পাট হইলে ভাতের ও ডালের হাঁড়ি দুইটা উনানের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া বাসন কয়খানা

একটা গামছায় বাঁধিল। আঁচলের সামান্য পয়সা ক'টা কোমরের কসিতে বাঁধিয়া গাছতলার চারিপাশটা ভাল করিয়া দেখিয়া মোটা কাঁথা দুইখানা দিয়া পশ্চিম দিকে একটা বিছানা পাতিয়া শিয়রে কাপড় ক'খানা রাখিল। আমি ত তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক্! এই বর্ষার রাত্রে একটা পোড়ো মাঠের গাছতলায় এই সঙ্গীহীনা স্ত্রীলোক সারারাত শুইয়া থাকিবে? কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। ইহাকে ত পথের ভিখারী মনে হইতেছে না। যেন চিরকাল রান্নাবাড়া ঘরকন্নায় এমন অভ্যস্ত যে গাছতলায়ও কোনো আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখে না।

ঘর হইতে অনেক ডাকাডাকি করার পর আমার ভৃত্য আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওখানকার ও মানুষটা কে রে? রাত্রে কি এই গাছতলাতেই থাক্‌বে? একবার খোঁজ করে দেখ দিকি।"

ভৃত্য ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "সে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে, ডাক্‌লে জবাব দেয় না। বেশী কথা কেউ জানে না। যা দু-চার জনকে জিজ্ঞেস্ করলাম তারা বলে, আপন মনেই কাজ কর্‌ছিল, এখানে থাক্‌বে তা কি করে জান্‌ব? কারুর সঙ্গে ত একটা কথা কয়নি। এখন দেখছি হঠাৎ শুয়ে পড়ল।"

বয়স নিতান্ত কম নয় কিন্তু খুব বেশীও নয়। গাছতলায় সারারাত শুইয়া থাকাটা চোখে বড়ই বিসদৃশ লাগে। রাত্রে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম একলা খোলা আকাশের নীচে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। সকালে আমার ঘুম ভাঙিবার আগেই দেখি সে তাহার কাজকর্ম্ম সুরু করিয়া দিয়াছে। পথের ধারে কলতলায় বাসনমাজা, জলভরা, স্নান, কাপড় কাচা একে একে সবই সারা হইল। কে বলিবে ইহা তাহার বাড়ির উঠানের

কূয়াতলা নয়? আর পাঁচজন কলের জল লইতে আসিলে মনে হইতেছিল সে যেন নিতান্ত দয়া করিয়া একটু সরিয়া গিয়া জল দিতেছে। আসলে কলটা তাহারই সংসারের সারাদিনের ব্যবহারের জন্য। উনানধরানো, চাল-ডাল ধোওয়া, রান্না-খাওয়া, পানসাজা সবই যথাক্রমে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কোনো তাড়াহুড়া ব্যস্ততা নাই, কোন ভাবনা-চিন্তা নাই, যেন গাছতলায় পাতা এই নূতন সংসারটির তদারকই তাহার বহুদিনের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহার রান্নাবান্না হইলে এখনই বাড়ির পাঁচজন আসিয়া খাইতে বসিবে। ছেলে বুড়ো কেহ বাদ যাইবে না।

তাহার উনানের হাত-দুই দূরে টেকো বুড়ো রহমান তার নাতিটিকে কোলে লইয়া আসিয়া বসিল, খানিকবাদে দুই চারিটা প্রশ্নও সুরু করিল, উত্তর পাইল কি-না বোঝা গেল না। একটু পরে আসিল আবু কোচম্যান, যতক্ষণ ভাড়াটে না মিলে একটু গল্পগাছা করিয়া ইহার সঙ্গে ভাব জমাইবার ইচ্ছা। সে কিন্তু কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া আপন মনে পিছন ফিরিয়া রান্না করিতে লাগিল। যাহা হউক মানুষগুলার অধ্যবসায় কমিল না।

আকাশের মেঘ কালো কালো দীর্ঘ জটার মত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ জোরে বৃষ্টি নামিল। রহমান নাতির মাথায় হাত চাপা দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল, আবুসেখ চট্ করিয়া পাল্কী-গাড়ীটার ভিতর ঢুকিয়া বসিল। সে কিন্তু এক ইঞ্চি নড়িল না, ঠিক সেইখানে বসিয়া উনানের আগুন উস্কাইতে থাকিল। পুঁটুলিসুদ্ধ কাপড় কাঁথা সব ভিজিয়া গেল, কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই।

ভৃত্য আসিয়া আমার ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া গেল, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বৃষ্টিটা থামিয়া যাইতে জানালা খুলিয়া দেখি—

পুকুর হইতে উঠিয়া বড় বড় সাদা রাজহাঁসগুলা লম্বা গলা ঘুরাইয়া ঠোঁট দিয়া পালকের জল ঝাড়িতেছে, আর আমাদের পথবাসিনী পুটুলি খুলিয়া কাপড়গুলা নিঙড়াইয়া মাঠের ঘাসের উপর মেলিয়া দিতেছে। কাকগুলা তাহার রান্নাঘরের সন্ধান পাইয়া নাচিয়া নাচিয়া ভাতের হাঁড়িতে ঠোক্কর দিতে আসিতেই কাপড় ফেলিয়া কঞ্চি হাতে সে কাক তাড়াইতে ছুটিতেছে।

সারা দিনই এমনি রৌদ্র ও বৃষ্টির খেলা চলিল! বার বার সে ভিজা কাপড় শুকায় আবার শুক্না কাপড় ভিজিয়া যায়। বর্ষার মাতামাতিতে আমার জ্বর বাড়িয়া গেল,—দুই তিন দিন মাথার যন্ত্রণায় পড়িয়া তাহার কোনো খোঁজই লইতে পারিলাম না। তাহার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

জ্বরটা ছাড়িলে মেঘছায়াচ্ছন্ন নারিকেলকুঞ্জের কথা মনে করিয়া জানালাটা খুলিলাম। দেখি জানলার কাছেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় বেশ সভা বসিয়া গিয়াছে। পথবাসিনীর সংসার ঘিরিয়া আবু সেখ, রহমান, ছিদাম, পানু—পাড়ার যত হিন্দু-মুসলমান জুটিয়া গিয়াছে। সকলেরই বেশ উৎসুক ভাব; বোধ হয় গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। সারাদিনই ফুটপাথের উপর দুটা একটা মানুষ পালা করিয়া উবু হইয়া বসিয়া আছে। কাজের মধ্যেই নানা গল্প চলিতেছে। উহারই মধ্যে দোকানীর কাছে চালটা ডালটা চাহিয়া আনা, গাছতলা হইতে কাঠকুটা কুড়াইয়া আনার ফাঁক করিয়া লইতে হইতেছে। তাহার ডাগর চক্ষের নির্ভীক চাহনি একটু ভীরু হইয়া আসিয়াছে, নিশ্চিন্ত চলাফেরায় কিসের ব্যাকুলতা ও ক্ষিপ্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বাড়ির ঝি-চাকরেরা দেখিতেছি এই কয়দিনেই তাহার নাড়ীনক্ষত্র জানিয়া ফেলিয়াছে, বোধ হয় গাছতলার সভায় তাহারাও

যোগ দেয়। বুড়ী ঝি বিকালে আমাকে ফল দুধ দিতে আসিয়া বলিল, "মাগো, মানুষটার বড় মন্দ কপাল। কায়েতের ঘরের বউ, শেষ কালে পথেই দাঁড়াবে না কি কে জানে? এমন বেহিসেবীও মানুষ হয়?" জিজ্ঞাসা করিলাম, "বউ কি রকম? ওর কি স্বামী আছে।" সে বলিল, "হ্যাঁ মা, আছে বইকি! চার চারটে ছেলে মেয়ে, মেদিনীপুরে খোড়ো বাড়ি, সব আছে। তার কি না এই দশা!"— "তবে এখানে গাছলতায় পড়ে মরতে এল কেন? ট্রেন ভাড়া করে বর্ষাকালে কলকাতায় গাছতলায় মানুষ থাক্‌তে আসে না কি?"

ঝি বলিল—"বলে ত—যে অনেক দিন ধরে পেটের গোলমালে ভুগছিল, সেখানে চিকিচ্ছে কিছুই হত না, বল্‌লে কেউ গা-ও কর্‌ত না। এবার স্বামী হঠাৎ রাজি হয়ে গিয়ে একেবারে কল্‌কাতার হাঁসপাতালে নিয়ে এল।"

হাসিয়া বলিলাম—'ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা! একেবারে আকাশের নীচে জল হাওয়া বৃষ্টি রোদ সবই প্রচুর পাচ্ছে। একেবারে নির্ম্মল হয়ে সেরে যাবে।"

ঝি কিছু না বুঝিয়াই বলিল,—"হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করে দিয়ে সে বাড়ি গেল, এদিকে ডাক্তার বললে—অম্বলের অসুখে আবার হাঁস-পাতালে কে রাখে? রোজ এসে ওষুধ নিয়ে যেও। স্বামীর বুদ্ধিটা দেখলে? দুদিন থেকে দেখে যেতে নেই?" সে কথার জবাব না দিয়া বলিলাম, "ভর্ত্তি করে আবার কখনও বার করে দেয় না কি?' ঝি বলিল, "কি জানি মা, ভদ্দর লোকের কাণ্ড কারখানা, গরিবের মরণে তাদের কি?"

আমি রাগিয়া বলিলাম, "তা বেশ ত, ভদ্দর লোক যদি হাঁসপাতালে নাই রাখে, নিজের গরিব স্বামীর কাছে গেলেই হয়। তা ত কেউ

বারণ করেনি! নিতে আসে না কেন লোকটা?" ঝি বলিল, "আসবে মা, মেদিনীপুর থেকে এসে নিয়ে যাবে। কাছে ত নয়। এখন বৌটা পানুদের দোকানের দালানে রাত্রে শুতে যায়। সেখানটা দিনে বিড়িওয়ালারা বসে তাই রাতটুকুন পায় খালি। এই ক'টা দিন কেটে গেলেই হবে।" বলিলাম "যে ভাল স্বামী, তাতে আসবাব আশা না করাই ভাল। হাঁসপাতালে বোধ হয় দরজায় বসিয়েই টিকিট কেটে বাড়ি চলে গেছে। একটা খোঁজখবরও ত মানুষ করে, হলই না হয় গরিব। ট্রেন ভাড়া জুটেছিল আর পোস্টকার্ডের পয়সা জোটে না?" ঝি বলিল, "জানিনে মা, অত কথা। আমায় যা বলেছে তাই বলছি। ওর স্বামী ওই জানে।"

হঠাৎ বাহিরে উন্মত্ত বাদল প্রলয় নাচন সুরু করিয়া দিল। নারিকেল গাছগুলি যা ভাঙিয়া পড়ে! দেখিতে দেখিতে মাঠের সবুজ গালিচা জলে সরোবর হইয়া উঠিল, ডোবার হাঁসগুলা কচি ছেলের মত টলিতে টলিতে আসিয়া সেই নূতন জলে খেলা সুরু করিল। পথবাসিনী তাহার হাঁড়ি-কুড়ি গাছতলায় উপুড় করিয়া রাখিয়া পুঁটুলিটা লইয়া আমাদের সিঁড়ির তলায় দাঁড়াইল। জল ও বাতাসের যুগল নৃত্যে তাহার গাছতলায় আর টেকা যায় না। কৃষ্ণচূড়ার শাখা-প্রশাখায় ঝড়ের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে।

বুড়ি ঝি আসিয়া বলিল, "মা, বউটা সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েছে, একবার দেখবে এস।"

সেদিন ভালই ছিলাম, বাড়ীতেও শাসন করিবার মত কেহ উপস্থিত ছিল না। কাজেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া একেবারে সিঁড়ির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মেয়েটা দেখিতে মন্দ নয়। ডাগর দুটি ভয়লেশহীন চোখ, মাথায় রুক্ষ চুলের মস্ত একটা খোঁপা, হাসিলে

এখনও গালে টোল খায়। কিন্তু বয়সে তরুণীর চপলতা নাই, মাতৃত্বের গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়িয়াছে। সিঁড়ির দরজা পার হইয়া ভিতরেই আসিয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ গা বাছা, ঝড়ে জলে পথে পথে আছ কেন? তোমার কি কেউ নেই?"

সে জিভ কাটিয়া বলিল, "সে কি কথা মা, আমার সাজন্ত ঘর, সব আছে। রোগের জ্বালায় বিদেশে এসে এখন বিপদে পড়েছি। নইলে মা, ঘরের বাইরে কোনোদিন পা দিইনি।" বলিলাম, "তোমার স্বামীকে একটা চিঠি দিলেই ত সে নিয়ে যায়।"

সে বলিল, "লিখতে ত জানি না মা, এই লোকগুলোকে দিয়ে লিখিয়েছিলাম। পেল কি-না তাই বা কে জানে, আর যদি জবাব দিয়ে থাকে হয়ত কার না কার হাতে পড়ে খোয়া গেছে। হয়ত ইচ্ছে করে ভুল ঠিকানা লিখেছে; কার পেটের কথা কে জানে?"

বলিলাম, "আমাদের ওই চালাটায় দু-চার দিন থাক, আমি তোমার চিঠি লিখে দেব, এখান থেকে এসে নিয়ে যাবে।"

কায়েত-বউ তাহার ডাগর চোখ তুলিয়া বলিল, "আপনারা কি জাত মা? আমি কায়েতের মেয়ে, যার তার ঘরে ত থাকতে পারি না।"

বড় রাগ হইল, চাল নাই চুলা নাই, থাকতে জায়গা দিলাম, তা আবার জাতের খোঁজ। বলিলাম, "জাতে আমরা মুচি। তা তোমায় ত রেঁধে খাওয়াব না, অত ভয় কিসের? থাকতে দিচ্ছি ভাগ্যি মান, তা না জাতকুলের খবর নিতে বসলে।"

সে বলিল, "হাড়ি মুচির ঘরে রাত কাটালে সোয়ামী কি আর ঘরে নেবে, মা! তার চেয়ে এই ভাল। চিরকালের ঘর খোয়ানোর চেয়ে দুদিন পথে থাকাই ভাল।"

বলিলাম, “পথের ধারে ওই যে গাড়োয়ানগুলোর হাসিতামাসা শোন বসে বসে ওতে কি স্বামী খুব খুশী হবে ?”

সে বলিল, “কি করব মা ? আমি ত তাদের হাসতে ডাকিনি। ঘরে নিজের স্বামী আজ দশ বছর হেসে কথা কয় নি, এখানে সবাই হাসির কথা শোনাতে আসে, তা কি আমার দোষ ? আমরা গরিব লোক ও-সব রং-তামাসা জানি না। কিন্তু এসে বসলে সবই সইতে হয়।”

হাসিয়া বলিলাম, “আমরা মুচি নয় গো, ওই চালায় দিনকতক থাক, তোমার জাত যাবে না।”

সে একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “না, মা, তোমার অনেক চাকর-বাকর, সাত জনের সঙ্গে ওখানে আমার সুবিধা হবে না। এই দোকানীর বারান্দাই ভাল, ভিতর থেকে বন্ধ করে একলা থাকি।”

বেশীক্ষণ তাহার সহিত তর্কের খেলা করিবার জোর ছিল না। “যা ভাল বোঝ কর বাছা,” বলিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

তিন দিন পরে দেখি কায়েত-বউয়ের সংসারে আসব‍াব বাড়িয়াছে। গাছতলার নিকানো গণ্ডীর ভিতর ঘুনসী-পরা একটি উলঙ্গ শিশু হামা দিয়া চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহিণী আজ সন্ত্রস্ত ; এই জলের গেলাস উপুড় হইল, এই ডালের ঠোঙ্গায় থাবা পড়িল, এই উনানের কাঠে টান। বউ তিন-চারিটা মুড়ির দানা তাহার বিরলদন্ত মুখে দিয়া তাহাকে এক জায়গায় স্থির করিয়া বসাইবার চেষ্টা যতবার করিল ততবারই সে ঠোঁট দুইটি টিপিয়া বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া হামা দিয়া আসিয়া জলের বাসনগুলায় দুই হাত ডুবাইতে লাগিল। যত হায়রাণি বাড়ে বৌ ততই শিশুকে সহবৎ শিখাইতে ব্যস্ত, দুইজনে

হাসিয়া অস্থির। আবু সেখ, পান্নু, ছিদাম আসিয়া হাসির কণা যতটুকু পারিল সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেল। পরিবর্ত্তে কেহ কিছু চাল, কেহ চারখানা কাঠ, কেহ একটু গুড় দিয়া দাতা নাম কিনিল।

বুড়ি ঝি জানালা দিয়া দেখিয়া বলিল, "আ মরণ, উনি আবার ভালমানুষের ঝি! নিজের ছেলে ঘরে পড়ে কাঁদছে, আর এখানে পরের ছেলে কোলে সোহাগ করা হচ্ছে। ওটা ওই ছিদ্‌মে লক্ষ্মীছাড়ার ছেলে।" জানালা দিয়া তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলাম। ছেলে কোলে করিয়া সে নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, "ও ছেলেটা জোটালে কোত্থেকে?"

বলিল, "ছিদামের বাড়ি গিয়েছিলাম, তার বউ আমাকে মা বলেছে, তাই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। বিদেশে বিভুঁইয়ে মেয়েছেলের সঙ্গে ভাব রাখা ভাল। নইলে একটা বদনাম উঠলে আর কি ঘরে ঠাঁই দেবে? তা ছাড়া জানই ত মা, মায়ের জাত কি ছেলে নইলে বাঁচে?"

আমি বলিলাম, "এমনিতেও ত ঘরে ঠাঁই দেবার কোনো লক্ষণ দেখছি না। ও তোকে ফেলেই হয়ত পালিয়েছে। নইলে কি একটা দিন থেকে ভাল করে ব্যবস্থা করে যেতে পারত না?"

সে বলিল, "না মা, পুরুষ মানুষ মারে ধরে বলেই কি আর পথে বার করে দিয়ে যাবে? ভাবছে মনে হাঁসপাতালে ত আছে, দশদিন পরে এসে খোঁজ করলেই হবে। ছেলেপিলে ফেলে তখন তাড়াতাড়িতে চলে গেছে।" একখানা পোষ্টকার্ড জোগাড় করিয়া তাহার স্বামীর নামে চিঠি লিখিয়া দিলাম, বলিলাম, "ডাকে ফেলে দে, যদি মানুষ হয় ত নিশ্চয় নিয়ে যাবে।"

পাঁচদিন কাটিয়া গেল, ঝড়ে বৃষ্টিতে রৌদ্রে এই অনাবৃত পথে আর কত কাল বাস করা চলে ? কিন্তু চিঠিও আসিল না, স্বামীরও দেখা মিলিল না। সব চুপচাপ।

বলিলাম, "কারুর বাড়িতে আশ্রয় নে না বাছা ! এমন করে কি মানুষ বাঁচে ?"

সে বলিল, "এ খিষ্টান মুসলমান পাড়ায় কোথায় কার ঘরে থাক্‌ব, মা, আমি হিন্দুর বউ !" বলিলাম, "তবে যা না বাপু, কোথায় হিঁদু পাড়া আছে। এখানে পড়ে মরতে হবে না।" সে ভীতচক্ষে বলিল, "বড় ভয় করে মা, জাতজন্ম খোয়ালে আর কি গেরস্তর ঘরে কেউ মুখ দেখবে ? এ তবু চেনাশুনো হয়ে এসেছে, এক রকম চলছে। এদেশে কোথায় কি পাড়া আমি কি কিছু চিনি ? বড় ভয়ে ভয়ে আমার দিন কাটে, মা।" বলিলাম, "তবে অত জাঁক না দেখিয়ে এইখানেই থাক্‌ না যে কদিন দরকার। হলামই বা খিষ্টান।" কি ভাবিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, 'আচ্ছা কাল আস্‌ব। ঘরটা আজ দেখে যাই।" চালা ঘরটা দেখাইলাম। একদিকে কেরোসিনের বাক্সে বাড়ীর যত ভাঙা কাঁসার বাসন, আর একদিকে কোদাল, টাঙ্গি, খুর্পি ইত্যাদি লোহার সরঞ্জাম ও গোটা-পনের চটের বস্তা পড়িয়া আছে ; মাঝখানে একটা ভাঙা তক্তাপোষ। বউ ঘর দেখিয়া বলিল, "ভাল করে বন্ধ হয় না।" তারপর চলিয়া গেল।

ধূলিকণার মত গুঁড়া বৃষ্টির ভিতর কায়েত-বউ সকাল বেলাই রান্না চড়াইয়াছিল। জানালা দিয়া তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতে-ছিলাম না, বৃষ্টি যেন পাতলা একটা উড়ন্ত মসলিনের পরদার মত আমাদের দুজনের মাঝখানে দুলিতেছিল। একবার মনে হইল মুখের উপরের বৃষ্টির জল সে আঁচল দিয়া মুছিতেছে, আবার মনে হইল বৃষ্টির

জল নয় চোখের জল। এত দুঃখে কোনো দিন তাহাকে কাঁদিতে দেখি নাই, আজ কি তবে সে সকল আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। হাঁটু দুইটার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া সে তাহার কান্না সাম্‌লাইতে লাগিল। এমন সময় একটা ছাতা হাতে পানু সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম ছাতাটা লইবার জন্য বউকে অনেক ঝুলাঝুলি করিতেছে, আজ কিন্তু সে দান লইতে বড়ই কুণ্ঠিত। তবু পানু ছাতা রাখিয়া চলিয়া গেল।

এক গাল হাসি ও পান লইয়া কে একটা গাড়ী হাঁকাইয়া গাছতলায় আনিয়া দাঁড় করাইল। কায়েত-বউ একটু ভীতদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া তারপর চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু একটুখানি হাসিল। গাড়ীর ভিতর চারটা ছোটবাঁশ ও একটা পুরানো তেরপল ছিল। বাঁশ চারটা চারিকোণে পুঁতিয়া উপরে তেরপলটা চাপা দিয়া আবু অনাবৃত রান্নাঘরের একটা ছাউনি করিতে লাগিয়া গেল। বুড়া রহমান নাতি কোলে যাইতে যাইতে সেদিকে তাকাইয়া বলিল, "বাহাবা তোফা।" মানুষগুলা শুধুই আড্ডা জমাইতে না আসিয়া আজ বেচারীর দুর্গতির একটু প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া তাহাদের উপর আমার মনটাও প্রসন্ন হইল।

বুড়ি ঝি খাবার লইয়া আসিয়াছিল, এইসব দেখিয়া বলিল, "বাছা আমার বাঁচ্‌লে বাঁচি, ঘোলে রুচি দুধে অরুচি। জাতের দেমাকে তোমার ঘরে থাক্‌ল না, মা, এখন জাত-কুল সব ধুয়ে খাচ্ছেন।" আমি বলিলাম, "চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়ী, লোকের নামে কথা রটাতে পেলে কিছু চাস না। মানুষের চামড়া গায়ে থাক্‌লে পরের দুঃখ কষ্টে মানুষ অমন করেই থাকে।"

সে বলিল, "হ্যাঁ দুঃখু কষ্ট না ত আর কিছু! ঐ গাড়োয়ানটা আমাকে নিজে বলেছে ও ওকে গাড়ী করে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়; আবার পানুর সঙ্গে তাই নিয়ে ওর ঝগড়া কত! বলে—যাক্ না পানুর চাল চিঁড়ে খেতে, একদিন হাড় ক'খানা ভেঙে রেখে দেব। লজ্জা-সরম সব ধুয়ে খেয়েছে মা, নইলে এমন ঢলাঢলি গেরস্তর বউ করে!"

আমি বলিলাম, "ওসব লোকটার দুষ্টুমি, বানিয়ে বলেছে ওর নাম খারাপ করবার জন্যে। তুই যত রাস্তার লোকের সঙ্গে বাজে গল্প করতে যাস্ কেন বল্ দিকি! অমন করলে তোকে দিয়ে আমার চল্‌বে না।"

বুড়ী তাড়াতাড়ি আমার পায়ে হাত দিয়া বলিল, "তোমার দিব্যি মা, বাজে গল্প করতে যাই না। ঘুঁটে কিন্‌তে গিয়েছিলাম ওরা এসে সাত কথা তুল্‌লে! বউটার ভালর জন্যে তাকে বল্‌তে গেলুম যে—যার তার সঙ্গে অমন হাওয়া খেতে যাস্‌নে মর্‌বি, তা এমন ন্যাকা সাজল মা, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, যেন হাওয়া খাওয়ার নামও কোনো দিন শোনে নি! ছোটলোকদের কাণ্ড জান না, মা, ওরা ভর সন্ধ্যেবেলা সেদিন একটা মেমকে মোটর গাড়ী করে নিয়ে পালাচ্ছিল! সে যাই মেম, তাই রক্ষে! সে পুলিশ ফরেদ কত কি করলে, আর কাঙালের মেয়ে কি বাঁচবে ওদের হাতে পড়লে?"

বুড়ির যত গুণ্ডার গল্প শুনিবার মত মস্তিষ্কের অবস্থা ছিল না। শুইয়া পড়িয়া বলিলাম, "বাপু, তোর গল্প শুনে আমার মাথা ঘোরে। আমায় একটু ঘুমোতে দে।"

বিকেল বেলা গাছতলার সভা খুব জাঁকাল হইয়া উঠিয়াছিল। আগে ত এত লোক দেখিতাম না। আরও পাঁচ-সাতটা দুষমণের মত

মানুষ, কেহ ঝুড়ি কেহ কোদাল, কেহ দড়ি কাঠ ও বস্তা হাতে করিয়া ময়লা কাপড় জামা পরিয়া যেন দিনমজুরীর কাজ হইতে ফিরিতেছে, এমনিভাবে একহাঁটু কাদাধূলা মাখিয়া সেখানে বসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা খুব হাসি-গল্প করিতেছে দেখিয়া মেয়েটার উপর আমার বড়ই বিরক্তি হইল। ভালই হইয়াছে আমার বাড়ীতে আনি নাই। বিরক্তিতে এবেলা আর তাহার মুখের দিকেও তাকাই নাই। তাছাড়া চারিধারে মানুষ গোল হইয়া বসাতে তাহাকে বিশেষ দেখাও যাইতে-ছিল না।

পরদিনও নূতন নূতন মানুষ আবির্ভূত হইতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে অভদ্র ঝগড়া ও খণ্ড যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সেইখানে বসিয়াই কায়েত-বউ তাহার নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিল, সুতরাং জিনিষটার ওজন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সংসারের শ্রী বাড়িয়াছে, মাথার উপর একটু ঢাকা, বসিবার একখানা পিঁড়া, ছোট একটি বঁটি। কিন্তু তাহার সে আত্মস্থ ভাব কাটিয়া গিয়াছে। ঘরকন্নার আগ্রহ আছে মনে হয় না, ইহাদের এই আনাগোনা ও কোলাহল যেন তাহার চারিপাশে কিসের একটা ঘূর্ণী নাচাইয়া তুলিয়াছে। তাহার সরল মনের স্থৈর্য্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যায় আজ সে একবার আমার সিঁড়ির তলায় আসিয়াছিল, তখনও তার গাছতলায় লোক বসিয়া। ঝি বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা কইতে চায়, মা।" বিরক্ত ভাবেই বলিলাম, "কি চাই, তোমার ?" সে হাত জোড় করিয়া বলিল, "মা, তোমার ওই ঘরটায় আজ আমাকে থাকতে দিও। কিন্তু একটা হুড়কো চাই, মা।"

বলিলাম, "দুবার ত সাধলাম, এলি কই ? এখন এক রাজ্যি লোক জুটিয়ে আবার আমার ঘরের উপর টান কেন ?"

ডাগর দুই চক্ষে মিনতি ভরিয়া সে শুধু হাতজোড় করিল কোন কথা বলিল না। যেন পিছনে তাহার কথা শুনিবার জন্য কে আড়ি পাতিয়াছে। "আচ্ছা, আসিস" বলিয়া ঘরে চলিয়া গেলাম। লোক-গুলা তখনও তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। উহাদের আরও অনেক-ক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল। একটা উত্তেজিত গলার স্বর কানে আসিতেছিল।

ভোরেই ঘুম ভাঙিল। অনেক দিন পরে সকাল হইতেই উজ্জ্বল নীল আকাশে পরিষ্কার রোদ উঠিয়াছে। সমুদ্রের ফেনার মত সাদা সাদা ফাঁপা মেঘ মাথার উপরে ছড়াইয়া আছে, যেন শরৎকাল। গাছ-তলায় দুইটা খোট্টা বুড়ী হলদে তালি-দেওয়া গোলাপী কাপড় পরিয়া পেয়ারাফুলী আমের ঝুড়ি লইয়া বসিয়াছে। কায়েত-বউ ত আসে নাই। রাত্রে আমাদের এখানে শুইতে আসিবে বলিয়াছিল তাহাও ত দেখিলাম না। তাহার ঘর-সংসারের তিনটা পোড়া ইট ও দুইটা পোড়া হাঁড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই। আজ এমন সুন্দর দিনে তাহার এত আলস্য, অথচ বাদ্‌লা দিনে ত দেখি ভোর না-হইতেই জিনিষপত্র সব লইয়া আসিয়া কাজে মাতিয়াছে। হয়ত আমার এখানে থাকিবে বলিয়াও আসে নাই, তাই লজ্জাতে অন্য কোনো দিকে নূতন করিয়া সংসার সাজাইয়াছে। কিছু আশ্চর্য্য নয়।

আরও বেলা হইল। তাহাকে কোনো দিকে দেখিলাম না। বুড়ী ঝিটা সকাল-বেলাই তাহার মেয়ের বাড়ী গিয়াছে, বিশ্বের গল্প শুনাইবার লোকই বা কোথায় যে পথের মানুষের খবর পাইব?

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় বুড়ী বাড়ি ঢুকিয়াই ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মাগো, এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিছু শোন নি?"

বলিলাম, "কেন রে কি হ'ল?"

সে বলিল, "পরশু রাতে ছিদামের দোকান ঘরে চুরি করে বউটা

পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। পানুটা ওর ভাবের লোক, দালানে শুতে জায়গা দিয়েছিল, তাই চুরি করলে গিয়ে ছিদেমের ঘরে। এত মনোহারী জিনিষ, একটা বস্তা ভর্ত্তি! এদিকে ছিদেমের বউ না কি ওকে মা বলে। মা হয়ে ছেলের গলা কাটা! ছিদাম ত রেগে আগুন, বলে ওকে এক বচ্ছরের জেল খাটাব। পানুরা বলেছে, গরিব দুঃখী লোক, টাকার লোভে চুরি করেছে, ওরা ওকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। কিন্তু ছিদ্‌মে কি সহজে ছাড়বে? মা সেজে সয়তানি কে সয় বল দিকি মা?"

কুড়ি-বাইশ দিন দোকান ঘরে কাটাইয়া দিবার পর আজ হঠাৎ চুরি করিল কথাটা বিশ্বাস হইল না। হয়ত এই দুষ্ট লোকগুলা শিখাইয়া-পড়াইয়া উহাকে চোর তৈয়ারী করিয়াছে, এমন হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। তাই হয় ত উহাদের ছাড়াইয়া আনিবার এত দরদ।

বিচার হইয়াছে, খবর পাইয়াছি। পানুরা ছিদামকে অনেক বুঝাইয়া বউটাকে ছাড়াইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু বউ ছাড়া চায় না, তাই আদালতে নিজে বলিয়াছে যে, জানিয়া শুনিয়াই জেলে যাইবার জন্য সে তাহার একমাত্র হিতৈষী ছিদামের ঘরে চুরি করিয়াছিল। এখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলে পৃথিবীতে তাহার আর কোনো আশ্রয় নাই। স্বামীর অন্নের আশা তাহার ঘুচিয়াছে, পরের অন্নের দাম সে দিতে পারিবে না। "পানুর ঘরে চুরি করতে ত আমি পারতুম, কিন্তু ও লক্ষ্মীছাড়া আমায় জেলে দেবে না জেনেই আমি ছিদামের ঘরে চুরি করেছি। আমায় ওদের হাতে আর সঁপে দিও না, বাবা" বলিয়া সে কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে।

কায়েত-বউ হাজতেই আছে, যাহারা তাহার ত্রাণ-কর্ত্তা হইতে চাহিয়াছিল, এখন তাহাদের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে।

মানসী

বাপ-মায়ের একটিমাত্র মেয়ে মানসী। মেয়ের কথায় তাঁহারা উঠেন বসেন, এতই তাহার আদর! আটটি সন্তানের ভিতর ওই একটিমাত্র শিব-রাত্রির সলিতা তাঁহাদের অন্ধকার বুক আলো করিয়া আছে। উহার মুখ চাহিয়া জীবনের সকল দুঃখ, হতাশা, বেদনা তাঁহারা ভুলিয়া আছেন। কিন্তু ইহাকেও একদিন স্বহস্তে পরের ঘরে তুলিয়া দিতে হইবে, তাই তিন জনের পছন্দ মিলাইয়া বর বাছাই হইত, তবু তাহার ভিতর মেয়ের কথাই সকলের অপেক্ষা বড়।

সম্বন্ধ ত হাজার জায়গা হইতে আসিতেছে। নাই-বা আসিবে কেন? মানসীর কোন্ গুণটা নাই? কন্যার সবার বড় গুণ যে রূপ, সে-রূপে বিধাতা ত বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। মেয়ে যেন পটে-আঁকা ছবি, গায়ের রঙে যেন আকাশের বিদ্যুৎ বাঁধা পড়িয়াছে, যে-পথে চলে বর্ণের আভায় পথ আলো হইয়া যায়। [illegible]-প্রতিমার মত নিখুঁৎ পেলব মধুর মূর্ত্তি, দেখিতে আসিয়া মানুষ কোন্ অঙ্গ হইতে কোন্ অঙ্গে চোখ ফিরাইবে ভাবিয়া পায় না। তাহার মাথার বর্ষার মেঘের মত ঘন চুল হইতে আরক্তিম পদপল্লবের মুক্তাস্বচ্ছ নখগুলি পর্য্যন্ত সবই যেন কোন্ মহাশিল্পী আপনার রূপস্বপ্ন সার্থক করিতে মনের সকল মাধুর্য্য ঢালিয়া গড়িয়াছেন।

সে রূপজ্যোতি আরও উজ্জ্বল করিয়াছিল পিতার অর্থ ও কুলগৌরব। ধনী ও কুলীন কায়স্থের একমাত্র কন্যা। এমন অনিন্দ্য সম্পদ আগ্রহ করিয়া ঘরে তুলিতে কে না চায়?

জমিদারের ঘরের প্রথম পুত্র নধর-গঠন বর মনোহর হীরার বোতাম হীরার আংটি পরিয়া আসিল কন্যা দেখিতে। পিতাপুত্রে মিলিয়া কন্যা পছন্দ করিয়া গেলেন তাঁহারা, কিন্তু হইলে কি হয়? কন্যা ঘরের বাহিরে আসিয়াই মাকে বলিল, "মা, অমন বোকা বোকা পয়সাওয়ালা মাড়োয়ারীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিও না। আমি কিছুতেই করব না। এই জন্যে কি আমায় এত লেখাপড়া শিখিয়েছিলে?"

মা কি আর করেন? সম্বন্ধ ভাঙিয়াই দিতে হইল। যদিও তাঁহার মনে এমন জামাই হাতছাড়া হওয়ার একটা অসন্তোষ স্থায়ী হইয়া রহিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময় মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পুত্র। কিন্তু বিলাত গিয়া অনেক বিদ্যাবুদ্ধির ছাপ নামের পিছনে জুড়িয়া আসিয়াছে। দেখিতে শুনিতে ভাল, কথাবার্ত্তায়ও বেশ ঘসামাজা সান দেওয়া একটা প্রখর দীপ্তি আছে। অপছন্দ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। কিন্তু বর হঠাৎ বলিয়া বসিল বিবাহের সময় তাহার চৌদ্দ হাজার টাকার প্রয়োজন আছে। না হইলে তাহার ঋণ শোধ হয় না। কর্ত্তা একটু বিরক্ত হইয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "বিলেত-ফেরতের হিসেব আবার আমাদের পাড়াগেঁয়েদের চেয়েও বেশী। তারা বাপের এক মেয়ে দেখে ধরেই নেয় টাকাটা মেয়েই সব পাবে, এরা আবার ভাবে—কি জানি কার মনে কি আছে, এক সঙ্গেই মেয়ে আর টাকা দুই-ই হাত করা ভাল!"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই ব'লে ছেলেমানুষের অত হুঁসিয়ার হওয়া আবার ভাল নয়। একটু লজ্জাতেও বাধল না!"

মানসীর কানেও কথাটা গেল। সে বাঁকিয়া বসিল। "শেষে জামাই কি টাকা দিয়ে কিনে আন্‌ছ? অমন যদি কর তবে আমি আর জলস্পর্শও করব না। তোমরা তোমাদের জামাই নিয়েই থেকো।"

ইহাকেও ছাড়িয়া দিতে হইল। কেহ লোভী, কেহ নির্ব্বুদ্ধি, কেহ কুৎসিত, কেহ হিসাবী, কেহ অভদ্র, কেহ দোজবরে, কেহ ছোটলোক, এমনি করিয়া কত জন ফিরিয়া গেল। মানসীর মনোহরণ করিতে কেহ পারিল না। সে তাহার প্রেমলোকের তপস্যায় নিজ ধ্যানলব্ধ যে-শিবের পূজা আপনার তরুণ মনের অসীম প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্যভার দিয়া এতদিন করিয়া আসিয়াছে, তাহার অনবদ্য দিব্য কান্তির সহিত এই-সব মানুষগুলির কি কোনই মিল থাকিতে নাই? ইহারা যেন কেবলই পৃথিবীর ধূলি দিয়া গড়া। ইহাদের চক্ষে সে অপূর্ব্ব স্বপ্ন, হাস্যে সে প্রসন্নতা, বাক্যে সে শালীনতা, দেহে সে বীর্য্য কোথাও ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু মানসীর নবীন মনের অমর আশা তবু তাহারই প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল।

মাতে মেয়েতে বেশ ভাব। মায়ের সঙ্গে বিবাহের বিষয় আলোচনা করিতে মানসীর বাধিত না। বর আসিত মানসীকে দেখিতে, কিন্তু বরকে আগাগোড়া দেখিয়া লইত মানসীই বেশী। এই সামান্য চোখের দেখা ও অতি সামান্য কানের শোনাতেই মানসীর মনের তাপমান যন্ত্রে ভালমন্দ লাগা এবং তাহার নানা কারণ বেশ স্পষ্ট চিহ্ন আঁকিয়া যাইত। মা বলিতেন, "ধন্যি মেয়ে বাপু তুই! মা-বাপে পাত্র দেখে, মেয়ে দেখে, বড়-জোর বর একটু মেয়ে দেখে যায়। তুই ধিঙ্গি হয়ে সবার আগে বর, বরের চৌদ্দ পুরুষ, সব তদারক করতে যাবি, এ রকম করলে তোর বিয়েই হবে না মোটে!"

মানসী বলিত, "না হয় নাই হবে। তাই ব'লে ঠক-বোকা-হাবা-বোবা যা ধরে দেবে তাই-ই করব নাকি? আহা, কি-না সব ছিরি! কেউ পরীক্ষা করতে বসেন যেন পাঠশালার গুরুমশায়, কেবল হাতে একটা ছড়ি থাকলেই হয়। কেউ যেন ঠিক পাটের দালাল, দর

হাঁকছেন বারো, সাড়ে এগারো, সওয়া দশ! কেউ-বা এমন হাঁ-করা-গঙ্গারাম যে দেখ্‌লেই হাসি পায়।”

মা তাড়া দিয়া চুপ করাইয়া দিতেন, “থাম্‌, আইবুড়ো মেয়ের অত ফটফটানি আবার ভাল নয়। যেখানেই যাও অত কথাও কেউ সইবে না, অত সাগর-ছেঁচা মাণিকও কোথাও পাওয়া যাবে না।”

সাগর-ছেঁচা না হউক পরিমলকে দেখিয়া সকলেই বলিল, “এ ছেলে হীরের টুক্‌রো।” পরিমলও নানা দিক্‌ দিয়া ঘুরাইয়া হীরার সহস্র রশ্মির মত মানসীর অসংখ্য যোগ্যতা যেমন দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছিল, মানসীও যেন তেমনি মুগ্ধ হইয়া গেল।

পরিমলের বয়স নিতান্ত কাঁচা নয়; যৌবন যায় নাই বটে, কিন্তু প্রথম যৌবনের উচ্ছলতার পরেই যেন কিসের একটা স্থৈর্য্য তাহার সমস্ত চঞ্চলতাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তা মার্জ্জিত, সংযত অথচ সে সদালাপী। তাহার কৌতূহল, লোভ, উচ্ছ্বাস, কি গর্ব্ব কোনটারই বাড়াবাড়ি নাই। মেয়ে দেখিতে আসিয়া সে কিংবা তাহার আত্মীয়টি কেহ অনাবশ্যক বিদ্যা-পরীক্ষার ছলে মেয়ের নাড়ী-নক্ষত্র জানিতে চেষ্টা করিল না, টাকাকড়ি দেনা-পাওনার কোনো কথাই সে তুলিতে দিল না, কন্যাপক্ষের কোনো প্রশংসায় কিংবা নিজ কীর্ত্তি-কলাপের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না। মানসীর পিতা উপস্থিত হইতেই সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের প্রবাসের এবং দেশের আধুনিক অবস্থার কথা ফাঁদিয়া বসিল, এবং মানসী আসিবার পরও সেই কথাই চালাইতে লাগিল। সে যেন আজ সান্ধ্যসভার নিমন্ত্রণে আলাপ করিতে আসিয়াছে।

মানসীর শিশুকাল হইতেই পরিমল তাহার কথা শুনিয়া আসিতেছে। মেয়েরা মেয়েদের নিন্দা করিতে পাইলে বাড়াভাত

ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে এই ছিল পরিমলের চিরকালের বিশ্বাস। তবু তাহার আত্মীয় মেয়েমহলে সম্প্রতি এই অনুপমা মানসীর প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়াই তাহার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে। বিশেষ গত এক বৎসর ধরিয়া মাসী পিসি, বোন ভাজদের মুখে ও চিঠিতে এই কথা ছাড়া অন্য কথা সে প্রায় শোনেই নাই।

মানসী কলিকাতায় পড়িয়া পাশ করিয়াছে, পাক-প্রণালী দেখিয়া সুখাদ্য প্রস্তুত করে, পিত্রালয়ের সকলে বিবাহে তাহাকে রাশি রাশি যৌতুক দিবে, ছোটবড় এই সব কোন কথাই পরিমলের অজানা ছিল না। কন্যা দেখিতে আসিবার পূর্ব্বেই যাহা যাচাই করিয়া লইবার তাহা সে লইয়াছে। এখন মানসীকে দেখিয়া ভদ্র রকম একটি নমস্কার করা ছাড়া এমন আর কিছুই সে করে নাই, যাহাতে সে কন্যা দেখিতে আসিয়াছে বুঝা যায়।

বরের অবস্থা সচ্ছল, স্বাস্থ্য সুন্দর, রুচি মার্জ্জিত, বিদ্যা-বুদ্ধি-বিনয় কিছুরই খুঁৎ চোখে পড়ে না দেখিয়া সকলেরই পছন্দ হইল।

মা বলিলেন, "মানসী, তুই কি বলিস্ রে?"

মানসী সলজ্জ হাসিয়া বলিল, "তোমরা কি চাও না-চাও তার আমি কি জানি? আমি কি বাড়ির গিন্নী?" মা খুশী হইয়া গেলেন।

পরিমলেরই গলায় বরমাল্য পড়িল। বিবাহের দিনে মানসীর অনুপম সৌন্দর্য্য বসনে ভূষণে, গর্ব্বে, আনন্দে ও তৃপ্তিতে যেন ঝলসিয়া উঠিল।

* * * *

বাহিরের উৎসবের উজ্জ্বল আলোক নিবিয়া গিয়াছে। আনন্দ ও উত্তেজনার মত্ততায় যাহারা মাতিয়া উঠিয়াছিল, তাহারা এখন যবনিকার অন্তরালে। এখন স্তিমিত দীপালোকে নিভৃত গৃহকোণে

কেবল দুইটি মাত্র মানুষ। মানসীর রত্ন আভরণ আগুনরাঙা বেশবাস সে খুলিয়া রাখিয়াছে! তাহার পরনে পীতাভ একখানি সরু জরি-পাড় শাড়ী, হাতে দুই গাছি চুড়ি আর আধখোলা চুলে এক ছড়া বেলফুলের মালা জড়ানো। পরিমল শান্ত হাসি হাসিয়া তাহার পুষ্পকলির মত হাত দুইখানি একসঙ্গে ধরিয়া বলিল, "বোসো, এইখানে।"

মানসী বলিল, "তুমি একটুখানি দাঁড়াও দেখি আগে।"

পরিমল বিস্মিত হইয়া মানসীর প্রেম-গভীর চোখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মানসী জানু পাতিয়া বসিয়া পরিমলের দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। মুক্ত কেশভার ও শুভ্র ফুলের মালা আলপনার পদ্মের উপর লুটাইয়া পড়িল। পরিমল তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এ কি, আমাকে নিয়ে এমন ক'রে লজ্জা দিচ্ছ কেন? আমি একটা সামান্য মানুষ।"

মানসী বলিল, "আমি যে এমনি করেই আমার জীবন সুরু করব কত দিন ধরে ভেবে রেখেছি। তোমাকে আমার নিজের থেকে অনেক বেশী বড়, ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল সুন্দর মনে করতে ইচ্ছা করে।"

মানসীর কথায় কোনো সঙ্কোচের জড়তা নাই। পরিমল বলিল, "মানুষকে অত বড় ভাবতে নেই মানসী। তুমি ছেলেমানুষ, তাই এ কথা বল্‌তে পারছ, বড় হ'লে বুঝবে মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়াই কত শক্ত।"

মানসী তাহার হাতের উপর আপনার কপালটা চাপিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, "আমার জন্যে তোমাকে বড় হতেই হবে যে। পারবে না তুমি?"

পরিমল দেখিল, মানসী ঠিক আধুনিক নববধূর মত নয়। স্বামীর দেওয়া অলঙ্কার আর আদর লইয়াই সে খুশী হইতে পারিবে না। সে

তাহার কৌমার্য্যের স্বপ্ন দিয়া যে কিশোর শিবমূর্ত্তি মনে মনে গড়িয়াছে স্বামী বলিয়া তাহাকেই সে চায়। পরিমলের বুক ঠেলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিল। এত বড় হওয়া কি তাহার সাধ্যে আছে? আজিকার স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের আদর্শের দিনে একথা ভাবিবার অবসরই ত মানুষের হয় না।

মানসী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার যেন কিসের একটা মস্ত দুঃখ! তোমার মন কি খুশী হয় নি?"

মানসীর শিশুর মত সরল মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চাহিয়া তাহার পদ্মকান্তি মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া আদর করিয়া পরিমল বলিল, "তোমার এমন মুখের আলোতেও যদি মন না আলো হয় তবে আমার অন্ধ হওয়াই ভাল।"

মানসী দুই হাতে তাহার মুখ চাপা দিয়া বলিল, "আজকের দিনে ওসব ছাই কথা তুমি মুখে আনবে না বল্‌ছি। আজ এমন কথা বল যা চিরকাল ধরে প্রতিদিন নূতন ক'রে ভাবতে মন মুগ্ধ হবে, যে কথা সুরে ছন্দে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কবিতার মত সুন্দর হয়ে উঠবে।"

হাসিয়া পরিমল মানসীকে কাছে টানিয়া বলিল, "মানসী, আমি ত তোমার মত কবিতারূপিণী অর্দ্ধেক কল্পনা আর অর্দ্ধেক মানবী নই, আমি নিতান্ত গদ্যময় পুরুষ। তুমি আমার জীবনে কবিতা এনে দাও, সে কাজ তোমাকেই সাজে।"

পরিমল ভাবিল নানা গুণের মধ্যে মানসীর এই একটা দোষের কথা সে ত শুনিয়াইছিল—এই অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা। আজ এ সব কথা ভাবিবার দিন নয়, তবু পরিমলের মনে পড়িল, দিদি বলিয়াছিলেন, "মেয়ে সংসারের কাজকর্ম্ম সবই শিখেছে বটে, কিন্তু সংসারের মতি

গতি বোঝে না। পৃথিবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ই নেই, কাব্য পড়ে কল্পনায় সংসার গড়েছে। চমৎকার মেয়ে, কিন্তু ওকে নিয়ে সাবধানে চলতে হবে।” কিন্তু এ কথাতে ত পরিমল ভয় পায় নাই, বরং আকৃষ্টই হইয়াছিল। সংসারে অভিজ্ঞ মানুষ দেখিয়া দেখিয়া চোখে ত জ্বালা ধরিয়া গিয়াছে। শকুন্তলার মত শরীরিণী কবিতার দর্শন পাওয়াই বরং দুর্ঘট। জীবনে তাহাকে সঙ্গীরূপে পাওয়া ত পরম ভাগ্য। বাল্যকালের স্বপ্ন এক দিন ত সকলেরই টুটিয়া যায়, কিন্তু ক্ষণিকের স্বপ্নবিহার জীবনের যে কয়েকটি মুহূর্ত্তকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে তাহার লোভ কি সামান্য? কত কাব্যরূপিণী সংসারে পোড় খাইয়া জমাখরচের খাতার মত নীরস গদ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা এ জীবনে পরিমল কি দেখে নাই? এক দিন তাহারাও পৃথিবীতে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর বীণাঝঙ্কার ছাড়া আর কিছু শুনিত না, এবং ছয় ঋতুর বর্ণসম্ভার ছাড়া মর্ত্ত্যলোকে আর কিছু দেখিতে পাইত না। কিন্তু তবু আজ সেই সব মেয়েদেরই সংসারধর্ম্মে পান হইতে চুন খসে না, জীবনের বসন্তপর্য্যায় সমাপনের পর তাহাদের কোনো আচরণে কাব্যগন্ধ ধরা পড়িতে আর দেখা যায় না! সুতরাং ভয় কিসের? মানসীও এক দিন সংসারসর্ব্বস্ব সুগৃহিণী হইয়া উঠিবে। আজ তাহার কাব্য-লোকের সৌরভই না হয় জীবনটাকে সমৃদ্ধ করুক।

মানসী বলিল, “এত সমারোহের মধ্যে এমন ক’রে না পেয়ে যদি অজানা-অচেনা পথের ধারে হঠাৎ ভিখারীর মত নিঃস্ব আমাকে কুড়িয়ে পেতে’ তাহলে কি আমাকেই তোমার চিরকালের সাথী বলে চিনতে পারতে?”

পরিমল উত্তর দিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল। সে ত অর্থ, সম্পদ, রূপ, গুণের সমারোহ দেখিয়াই আসিয়াছিল, যে ছাড়া জগতে তাহার

আর দ্বিতীয় দোসর নাই তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবার কল্পনা ত করে নাই। সাধারণ মানুষ যেমন সকল দিক্ দেখিয়া আসে সেও তেমনি আসিয়াছিল, প্রেমতীর্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবার কথা ত তখন মনে পড়ে নাই। বাহিরের সকলই দেখা হইয়াছিল, কিন্তু এই যে মানুষটি তাহার দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিতেছে, সব-কিছু বাদ দিয়া একান্তই ইহার কথা ত ভাবিয়া দেখা হয় নাই। মানসীর চোখের ভিতর চাহিয়া পরিমল বলিল, "আজ ত তোমাকে নিশ্চিত চিনেছি, আর কবে কোন্ দিন চিন্‌তে পারতাম কি-না সে-কথা ভেবে কি লাভ বল ?"

মানসী বলিল, "লাভ আছে বই কি ? পৃথিবীতে যেখানে যেমন করেই লুকিয়ে থাকি না, এত মানুষের এত রূপ গুণের ভীড়ের মাঝখান থেকে তুমি এসে আমাকে বেছে হাত ধরে নিয়ে দাঁড়াবে মনে করে যে আনন্দ হয় তার চেয়ে বড় কি আছে ?"

পরিমল বলিল, "তোমার মত প্রেমের দিব্যদৃষ্টি কি সকলের থাকে, মানসী ? হয়ত আমি কত ভুল করে করে তবে তোমায় খুঁজে পেতাম কে বল্‌তে পারে ?"

মানসী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "কি অদ্ভুত মানুষ তুমি ! ভুল করার কথাটাই আগে মনে হ'ল !"

* * * *

পরিমলের ছবির মত সুন্দর ছোট বাড়িখানি শহর হইতে একটু আড়ালে, ভাগীরথীর কূলে। তিনতলার ছাদের উপর নদীর দিকে মুখ করিয়া একখানি মাত্র ঘর। সমস্ত দিন ঝিরঝিরে জলো হাওয়া ঘরের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছে ; যে আসিয়া দাঁড়ায় তাহারই গায়ে যেন স্নিগ্ধ চন্দন-পরশ বুলাইয়া দেয়। ঘরের ছোট দুই জোড়া দরজা রূপমুগ্ধ

কবির দুটি চোখের মত অপলকে অষ্টপ্রহর নদীর দিকে চাহিয়া আছে। খড়ে বোঝাই নৌকার সারির পর কাঠের নৌকা, ধানের নৌকা চলিয়াছে পাল তুলিয়া অতি ধীরমন্থর গতিতে, যেন জলে এমনি অলস ভাসিয়া চলা ছাড়া তাহাদের এ যাত্রার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই। মাঝে মাঝে মাছের নৌকা একটু ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া তীরের দিক ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতেছে। মাঝিরা মাথার উপর শূন্যে প্রকাণ্ড জাল চক্রের মত ঘুরাইয়া জলে ছাড়িয়া দিতেছে, আবার ধীরে ধীরে টানিয়া রূপালি মাছের চঞ্চল বোঝা সমেত নৌকায় তুলিয়া লইতেছে। কলের চাকায় জল ছড়াইয়া আর আকাশে-বাতাসে ধোঁয়ার পিচকারী দিয়া ষ্টিমার এদিকে বড় আসে না।

নদীর ধারের নিরালা এই বাড়িখানিতে পরিমল মানসীকে লইয়া আনিয়া তুলিল। মানসী দেখিয়া খুশী হইয়া উঠিল যে বৌ তুলিতে বাড়িতে লোকের সমারোহ মোটেই হয় নাই। বিবাহের মর্য্যাদা রাখিতে দরজার দুইধারে দুইটি মঙ্গল কলস, সিঁড়িতে শুভ্র আলপনার বৈচিত্র। দরজার ভিতর পরিমলের ছোট বোন সুধা একেবারে একলা একখানা রূপার থালায় দুধ ও আলতা গুলিয়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, বৌকে দুধে আলতায় দাঁড় করাইয়া ঘরে তুলিবে। তাহার সঙ্গে পাড়ার পাঁচজন এমন কি দুই চারিটা পুরাণো দাসীও নাই। দূরে একটা ঝি সুধার তিন বছরের মেয়েকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে; সে মানুষটা একেবারেই আনকোরা বলিয়া চাঞ্চল্যে ও কোলাহলে বিবাহ-বাড়ি মাতাইবার কোনো চেষ্টা করিতেই সঙ্কোচ বোধ করিতেছে। তাহাদের বাড়ির সহস্র কণ্ঠের একতান সঙ্গীতের পর এই নীরব অভ্যর্থনা মানসীর মনে বিস্ময় জাগাইল বটে, কিন্তু প্রাণটা যেন তাহার জুড়াইয়া গেল। ঠিক এমনি নিভৃত নির্জ্জন একটি কোণ সে মনে-প্রাণে চাহিতেছিল,

আপনাদের হৃদয়ের উৎসবের সমারোহে শুধু দুইজনে তাহা পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে বলিয়া।

বৌকে ঘরে তুলিয়া সুধাই তাহাকে লোহা পরাইয়া মিষ্টিমুখ করাইয়া গলায় এক ছড়া মুক্তার মালা পরাইয়া দিল।

পরিমল বলিল, "যা সুধা, তোর বৌদিকে উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম করতে দে গিয়ে; আমি একটু এদিকে কাজকর্ম্ম কয়েকটা দেখে যাই।"

মানসী পরিমলের সুব্যবস্থায় ক্রমেই বিস্মিত হইতেছিল। বাড়িতে কোলাহল করিবার মানুষের অভাব আছে বটে, কিন্তু কাজের মানুষের নিশ্চয় অভাব নাই। গোপনে নীরবে বহু যত্নে কাজ করিয়া তাহারা চোখের আড়ালে সরিয়া গিয়াছে, উপরের ঘরে পা দিয়াই মানসী বুঝিতে পারিল। সুন্দর বেগুনফুলি রং করা ঘরে বেগুনী রঙের রেশমের পরদা দেওয়া দরজা-জানালা; মেঝেতে নীলকণ্ঠি, বেগুনী, ঘন আলতা ও সোনালী রঙের বিচিত্র মিশ্রণে বোনা দুটি ছোট কার্পেট; একটিতে পা দিয়া কালো আবলুষ কাঠের জোড়া পালঙ্কে উঠিতে হয়, আর একটির উপর ছোট দুটি গদি-আঁটা চেয়ার ও ছোট একটি তেপায়া টেবিল। কালো আলমারীর গায়ে এক-মানুষ উঁচু একটা আরসি আঁটা, তাহারই ভিতর দিয়া মানসী দেখিল পিছনে আর একখানি দাঁড়ানো আয়নার ভিতর মানসীরই অবগুণ্ঠিত কবরীর স্বর্ণপদ্ম হইতে গোড়ালির আলতা ও ঘুঙুর পর্য্যন্ত ছবিটি ধরা পড়িয়াছে।

মানসী হাসিয়া ফেলিল। সুধা বলিল, "বৌদি, দেখছ কি? দাদা সকল দিকে পাহারা খাড়া করেছে। কোনো দিক্‌টি লুকোতে পাবে না।"

মানসী নূতন বৌ, ঠোঁটের আগায় জবাব আসিলেও কিছু বলিল না।

পাশেই পোষাক-পরার ঘরে একটা আলনায় ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবী, আর একটিতে তিন চার রঙের তিন চারখানা নূতন শাড়ী, মার্বেল পাথরের তাকে প্রসাধনের কোনো মালমশলার অভাব নাই, দেয়ালের পিতলের খুঁটিতে ছোটবড় নানা মাপ ও ধরণের কাচা তোয়ালে।

মানসী এবার না বলিয়া পারিল না, "এত আয়োজন করে রাখবার কি দরকার যে ছিল!"

সুধা বলিল, "তুমি আমাদের কত আদরের জিনিষ তা এ সামান্য আয়োজনে যে ভাই কিছুই বোঝানো যায় না।"

জনবিরল গৃহে কতক্ষণ আর পরস্পরকে দূরে রাখিয়া চলা যায়। কখন যে মানসীর বিশ্রামের সব ব্যবস্থা করিয়া অলক্ষ্যে সুধা সরিয়া গিয়াছে আর পরিমল আসিয়া তাহাকে পিছন হইতে গ্রীবায় একটি চুম্বন দিয়া সচকিত করিয়া তুলিয়াছে মানসী জানিতে পারে নাই। লজ্জিত মুগ্ধ চোখ দুটি উপরে তুলিয়া চাহিতেই পরিমল বলিল, "চুপটি ক'রে একলা কিসের ধ্যান করছ, মানসী?"

মানসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া পরিমলের দুই কাঁধে দুটি হাত রাখিয়া রাঙা ঠোঁট উল্টাইয়া অভিমানের সুরে বলিল, "ধ্যান করা ছাড়া আর কি কাজ আছে আমার?"

পরিমল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "বড় একা পড়েছ, না? সুধা ছাড়া কেউ নেই, তা সেও সারাদিন সংসার আর মেয়ে নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাই ত সব কাজ ফেলে দিনে দুপুরে ছুটে উপরে এলাম। আর এখানে কাকেই বা লজ্জা করব বল?"

মানসী এবার হাসিয়া বলিল, "সেইজন্যে বুঝি বলছি আমি? তুমি পুরুষমানুষ, এমন করে যদি ঘরকন্না গুছিয়ে রাখ ত আমি কি করব বল দেখি?"

পরিমল বলিল, "এই দু-ঘণ্টায় তুমি কি আমার সব ঘবকন্না দেখে ফেলেছ ? ভবিষ্যতের সবটাই ত তোমার হাতে, তখন যত পার গুছিও।"

মানসী বলিল, "না বাপু, তোমার ধরণ দেখে আমাব সে রকম আশা একটুও হচ্ছে না। তোমার মত স্বামী নিয়ে কাজের লোকের চলে না। পুরুষমানুষ হবে কচি ছেলের সামিল। লম্বায় চওড়ায় খালি বেড়ে যায়, নইলে সংসাব বুদ্ধি আবার তাদের কবে থাকে ?"

পরিমল বলিল, "তাই নাকি ? বিয়ে না করতেই স্বামী সম্বন্ধে এত অভিজ্ঞতা হ'ল কোথা থেকে ?"

মানসা বলিল, "আহা পাঁচজনকে দেখে আব কিছু বোঝা যায় না, না ? আমাকে তুমি কচি খুকি পেয়েছ কি না ! আমাদের কুসুমদিদির স্বামীট বেশ। ঘরে ঢোকে যেন ঝড় ! বই-ছাতা, জামা-চাদর, জুতো ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতে সদর দরজা থেকে শোবার ঘর পর্য্যন্ত ছড়াতে ছড়াতে চলে। আর কুসুমদি আবার উল্টো পথে শোবার ঘর থেকে সদরদবজা পর্য্যন্ত সেগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে আনে !"

পরিমল বলিল, "এ আর শক্ত কথা কি ? তুমি যদি চাও ত আমি ঘরে যত লাঠিসোঁটা আছে সব সারা বাড়িময় ছড়িয়ে দেব, যত পার কুড়িও।"

মানসী বলিল, "কি যন্ত্রণা ! গল্পটা শেষ করতে দাও আগে। কুসুমদিব স্বামা ছিল পণপ্রথানিবারণী সভার সভ্য, তাই বিয়ের সময় খাট-বিছানা পর্য্যন্ত নিলে না। তারপর বৌ নিয়ে গিয়ে বাসাবাড়িতে উঠল। বাড়িতে আসবাবের মধ্যে একটা পা-ভাঙা তক্তপোষ, একটা এক-মানুষ উঁচু টুল, খান-তিনেক বিছানার চাদর আর দুটো তোয়ালে। বিছানার খোঁজ করতে চাকরটা বললে, "বিয়েতে ত সবাই নতুন বিছানা

পায়, তাইতে হরি কাকাবাবু পুরানোটা কাল নিয়ে চলে গেল, চাদর ক'টা ধোপার বাড়ি ছিল তাই বেঁচে গেছে। মেসের বাড়ি বদল করে আনবার সময় এ বাড়ির দরজা মাপা হয় নি, তাই তক্তপোষটা দরজায় ঢোকে না বলে মুটেরা একটা পা ভেঙে ঢুকিয়ে গেছে।' কুসুমদি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তার স্বামী বললে, 'তাই ত কুসুম, আজ রাত্রে কি করে ঘুমোন যাবে বল দেখি।' সেই দিনই গাছকোমর বেঁধে তক্তা মেরামত করা কুসুমদির কপালে ছিল এবং তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত তার সুন্দর সাজানো সংসারে যেখানে যা-কিছু দেখবে সবই সে নিজে হাতে মেপেজুখে হিসেব করে করিয়েছে, সাজিয়েছে। স্বামীর ওর দুটি কাজ, এক টাকা এনে দেওয়া আর এক কুসুমদির কাছে জগতের সব অসম্ভব জিনিষের আব্দার করা। কিন্তু ওদের মত সুখী স্বামি-স্ত্রী দেখা যায় না।"

পরিমল বলিল, "তবে কুসুমদির স্বামীর গলাতেই মালা দিলে না কেন? এ অভাগার ত কোন যোগ্যতাই নেই।"

মানসী বলিল, "দেখ, ওই পচা রসিকতাগুলো কোরো না, আমার একটুও ভাল লাগে না।"

পরিমল তাহকে টানিয়া জানালার ধারে আনিয়া বসাইয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার কি ভাল লাগে তাই বল না শুনি। আমি না-হয় কিছুই বলব না।"

মানসী বলিল, "বাবা ত আমার জন্যে সব জিনিষ-পত্রই করিয়েছেন, এসে পড়তে একটু যা দেরী। যদি কিছু বাকি থাকত আমি সেগুলি সব করে গুছিয়ে-গাছিয়ে সংসার সাজাতাম, তবে না গিন্নী হওয়ার সুখ। তুমি কেন আগে থাকিতে বিশের ব্যবস্থা করে রেখে আমায় পুতুলটি করে এনে বসালে? মেয়েমানুষের মত এমন নিখুঁৎ করে সংসার গুছিয়ে

রাখলে পুরুষকে মোটেই মানায় না। এমন ঘরে বৌয়ের আর কি দরকার? কিই বা কাজ?"

পরিমল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। মানসী তাড়াতাড়ি তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটা তুলিয়া বলিল, "রাগ করলে বুঝি? আচ্ছা, আর আমি ওসব বলব না।"

পরিমল মানসীর কোলের ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "মানসী, যা হয়েচে তা হয়েছে। ও ত ঘোরানো যাবে না। এর পর আমি তোমার কুসুমদির স্বামীর চেয়েও অবুঝ দস্যি ছেলে হয়ে উঠব। তখন আমার বৌয়ের কাজের অন্ত থাকবে না। তুমি দেখে নিয়ো আমার স্বভাবই ঠিক অমনি, চেষ্টা করে কিছু করতে হবে না।"

সেদিনকার মত ঝগড়া মিটিল বটে, কিন্তু মানসীর সেবা-উন্মুখ মনটা তৃপ্তি পাইতেছিল না কিছুতেই। সুধাও দুই চার দিন পরে চলিয়া গেল; নূতন বৌ লইয়া ঘটা করিয়া আদর-অভ্যর্থনা করিবার জন্য শাশুড়ী, ননদ জা পাঁচজন কোথাও নাই। সে-ই বাড়ির গৃহিণী। অথচ তাহার চারিধারে এত আয়োজন এত সমারোহ যেন তাহার গৃহিণীত্বকে গলা টিপিয়া মারিতেছিল। বাপের বাড়িতে আরামে বিলাসে সে অভ্যস্ত, কিন্তু সেখানে সে ছিল তাহার মায়ের সেবা-প্রবণতার আধার। এখানে তাহার পদবৃদ্ধি হইয়াও তাহাকেই নিষ্কর্ম্মা বসিয়া আপনার কল্পিত সংসারের কর্ম্মনিপুণা গৃহিণীর ছবিট মনে মনে ভাঙিয়া চুরমার করিতে হইতেছে, ইহাতে প্রতি খুঁটিনাটি আয়োজনই তাহাকে পৃথক ভাবে পীড়া দিতেছিল।

তাহার নিজের জন্য সব আয়োজন ত আছেই তাই একদিন সে চলিল পরিমলের অজ্ঞাতে তাহার পোষাকে আষাকে জিনিষপত্রে আপনার সেবার একটু স্পর্শ রাখিয়া আসিতে। কাপড়ের আলমারীর

চাবিটা লাগানো নাই, মানসী একটা টান দিতেই খুলিয়া গেল। থাকে থাকে কাপড় জামা-চাদর আবার শার্ট-কোট ইত্যাদি বিলাতী পোষাক। ছোট দেরাজে আলাদা করিয়া ডজন ডজন রুমাল মোজা, টাই-কলার যথাস্থানে সজ্জিত। দুই এক জায়গায় টানাটানির সামান্য চিহ্ন আছে, খুব বেশী নয়। টেবিলে ঢাকা, চেয়ারে কুশান, আলোয় শেড সবই পরিমল দিয়া রাখিয়াছে, বিলাস-ঐশ্বর্য্যের কোনো অনুষ্ঠান বাকি নাই। মানসীর মনটা দমিয়া গেল, শুধু নিজের সেবার ক্ষেত্র না পাওয়ার জন্য নয়, পরিমলকে এত বিলাসে অভ্যস্ত দেখিয়াও। বিবাহের আগে পরিমলকে দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল তাহার স্বামীটি হইবে ভোলানাথ মহেশ্বরের মত উদাসীন, সে-ই তাহাকে অল্পে অল্পে নানা সুখ ও আরামে ঘিরিয়া ক্রমে সংসারের পাঁচজনের মত করিয়া তুলিবে। কোথায় কোথায় কেমন বেশবাস পরিতে হয়, কোন্ গৃহসজ্জাটির কি প্রয়োজন, সব সে-ই একটি একটি করিয়া স্বামীকে শিখাইয়া নব্য করিয়া গড়িবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু এ ত দেখিতেছি তাহার চেয়েও সভ্য ও নব্য। এ যেন বড় বেশী সংসারী। সংসার করিবার সাধ তাহারও আছে বটে, কিন্তু এমন নিখুঁৎ সংসার কি নূতন প্রেমের সঙ্গে মেলে? বার-বার নানা অভাব, নানা বিশৃঙ্খলা, নানা বেহিসাব শুধু তাহাদের প্রেমের ঐশ্বর্য্যেই তাহারা জয় কারয়া যাইবে, আর পরস্পরকে দিবার আগ্রহে ধীরে ধীরে সংসার গড়িয়া উঠিতে থাকিবে, এ না হইলে পথ চলার আনন্দ কোথায় হইল? এ যেন সকলের সেরা পথটুকু বাদ দিয়া একেবারে মধ্যজীবনে আসিয়া পড়া।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। নদীর জলে আকাশের এক চাঁদ হাজার হাজার টুক্‌রা হইয়া ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নাচিতেছিল। মাঝে মাঝে দুই-একটি ছই-ঢাকা পান্‌সি চাঁদের আলোর ভিতর ছোট কেরাসিনের

আলোর রশ্মি ছড়াইয়া ভাসিয়া যাইতেছিল হয়ত কোনো সৌখীন যাত্রীকে নৌকা-বিহার করাইতে। এমনি চাঁদিনী রাত্রে পরিমলের সহিত নৌকায় বেড়াইতে মানসীর বড় সাধ ছিল। এই ত দু-দিন আগে সে পরিমলকে বলিয়াছিল লইয়া যাইতে। পরিমল বলিয়াছিল—"না না, কোথায় রাত্রে জলে ডুবে যাবে, অমন কবিত্বে কাজ নেই!"

মানসী ভাবিতেছিল, "অদ্ভুত মানুষ এই পরিমল!" এই কয় দিনেই মানসীর মনটাকে সে এমন করিয়া গ্রাস করিয়াছে যে, তাহার কথা ছাড়া অন্য কথা মানসী ভাবিতে পারে না; এক ঘণ্টার জন্য সে বাড়ির বাহিরে গেলেও মানসীর মনটা ব্যথায় টন্ টন্ করিয়া উঠে। তাহার মুখ দেখিয়াই সকল প্রয়োজন বুঝিয়া লইতে মানসী যেন উন্মুখ হইয়া থাকে। পরিমলও তাহাকে কম সুখে রাখে নাই। কিন্তু যাহার ঘর-সংসারের পার্থিব সুখ-সুবিধার দিকে এত দৃষ্টি সে-ই যেন একটা জায়গায় কেমন তালকাণা। সেদিন সন্ধ্যায় মানসী যখন খোঁপায় কনকচাঁপার মালা জড়াইয়া মাথার ঘোমটা খুলিয়া ছাদের আলিসার ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল, তখনও চাঁদের আলো এমনি চারি ধারে রহস্যের শুভ্র জাল মেলিয়া দিতেছিল। পরিমল ছাদে আসিয়াই একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর বলিল, "মানসী, সিনেমা দেখতে যাবে? আজ চমৎকার একটা ফিল্ম আছে।"

মানসী বলিল, "আজকে যেতে ইচ্ছে করছে না একটুও? এইখানেই বোসো না।"

পরিমল বলিল, "একবার যদি গ্রেটা গার্বোকে দেখতে তাহলে আর ও কথা বলতে না।"

মানসী হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা থাক্, যারা সাম্নের মানুষকে দেখতে পায় না, তাদের আর গ্রেটা গার্বো দেখে কাজ

নেই।" বলিয়া খোঁপা হইতে খুলিয়া ফুলের মালাগুলা সে ছাদের উপর হইতে নীচে ফেলিয়া দিল। পরিমল হাসিয়া বলিল, "এই জন্যে এত রাগ! ফুলের মালা ত সব মেয়েই খোঁপায় জড়ায়। ওতে নূতন আর কি আছে, এই ভেবে কিছু বলি নি।"

কি যেন সৃষ্টিছাড়া মানুষ! ঠিক যে কথাগুলি শুনিবার জন্য মানসীর মনটা ব্যাকুল হয়, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অগত্যা নিজেই সে যে-কথার সূত্র পরিমলকে ধরাইয়া দিতে চায়, ঠিক সেই কথা কয়টাই যেন পরিমলের মুখে কিছুতেই আসে না। এক এক সময় মনে হয় মানুষটা একেবারে বৃদ্ধ হইয়াই বুঝি জন্মাইয়াছিল, প্রণয়িনীর সঙ্গে কেমন করিয়া কথার লীলা করিতে হয় তাহাও ইহাকে শিখাইয়া দিতে হইবে। আবার মনে হয়—না, ইচ্ছা করিয়াই ওই গাম্ভীর্য্যেব দেওয়ালটা সে খাড়া করিয়া রাখে, মানসীকে তাহার মনের গোপনতম কক্ষগুলিতে ঢুকিয়া পড়িতে দিবে না বলিয়া।

কয়দিনেরই বা তাহাদের পরিচয়, এখন ত প্রণয়-গুঞ্জন ছাড়া অন্য কথা শুনিবাব ধৈর্য্যই মানসীর নাই। অথচ পরিমল ঘর-সংসারের সুখ-সুবিধা স্বাস্থ্য শিক্ষা—কেবল এই সব হাজার কথা বলিবার এত উৎসাহ পায় কোথা হইতে? কালও নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মানসী যখন এলোচুলের রাশ পিঠে ছড়াইয়া নদীর জলের একটানা সুরের সঙ্গে আপনার স্বপ্নের গান মিলাইতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন পরিমল আসিয়া বলিল, "চাকরগুলোর কাজকর্ম্ম তোমার পছন্দ হচ্ছে ত? রোগা হয়ে যেন বাপের বাড়ি ফিরো না। আমার নিন্দে হবে।" মানসী বলিল, "এ কি, তোমার আপিসের বড়সাহেব তোমার বাড়ি অতিথি হয়ে এসেছেন ভাবছ না কি? সারাক্ষণ কেবল যত বাজে

কথা! অন্য কথা যদি বলতে না জান ত অত সেবাযত্নের কথা বলতে হবে না।"

পরিমল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কেন কোন্ কথাটা না বলি? বোম্বের হাঙ্গামে গান্ধীজী কি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করছেন পড়েছ কাগজে?

মানসী রাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

আজও তাহারই আদর সোহাগে ডুবিয়া এই পৃথিবীটা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইবার আশায় জ্যোৎস্নারাত্রে মানসী পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। ঘরসংসারে যত আসবাব আয়োজন সে দেখে তত যেন পৃথিবীটাই তাহার চোখে উৎকট হইয়া উঠিয়া মনকে পীড়া দিতে থাকে! এসব ভুলাইয়া দিবার ক্ষমতা ত পরিমলের আছে, প্রাণ ভরিয়া মানসী তা বিশ্বাস করে। তাহার আশারও শেষ নাই। প্রতিদিনই অতৃপ্ত হৃদয়ে সে পরিপূর্ণ তৃপ্তির প্লাবনের আহ্বান করে। বিশ্বজগৎ ভুলিয়া একবারও কি পরিমল কেবল একমাত্র মানসীর মনের ভিতর তলাইয়া যাইতে পারে না?

চন্দ্রালোকেব সমস্ত মোহিনী মায়াকে ছিন্ন করিয়া হঠাৎ এক বেহারী মুটের কণ্ঠস্বর উঠিল, "আরে, কিধর বাতাও না বাবুসাহেব।" মানসী চাহিয়া দেখিল, গ্রামোফোন ও রেকর্ডের বাক্স মাথায় করিয়া একটা মুটে উপরে উঠিতেছে, পিছনে পরিমল! মানসীর চোখে জল আসিয়া গেল। পরিমল যেন কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত সুর করিয়া বলিল, "ভাল ভাল রেকর্ড বেরিয়েছে আজকাল। তোমাব খুব ভাল লাগবে, আমি নিশ্চয় বলছি!"

মুটেটাকে বিদায় করিয়া মানসী বলিল, "না, আমার তোমাকে ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না।" পরিমল হাসিয়া বলিল, "তাহলে ত খুব সস্তার ব্যাপার দেখছি, আমি ত তোমারই রয়েছি।"

মানসী পরিমলের দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া বলিল, "আমার যদি তবে এমন পুরুতঠাকুরের মত আমায় বসিয়ে রেখে কেবল দূরে দূরে বেড়াও কেন ?"

পরিমল বলিল, "এই বুঝি দূরে থাকা হ'ল ?"

মানসী বলিল, "আমি অতশত বুঝিয়ে বলতে পারি না বাপু, তুমি কেমন যেন বানিয়ে বানিয়ে কেবল বাইরের কথা বল। তোমার মনটাকে মোটে দেখতে পাই না। যেন একটুখানি খোলা আর অনেকখানিই ঢাকা।"

পরিমলের গলাটা একটু ভার হইয়া আসিয়াছিল, সে বলিল, "কি করলে তুমি আমায় যেমনটি চাও তেমনি হব, তুমিই আমায় শিখিয়ে দাও মানসী। আমার নিজের বুদ্ধিতে ত পথ পাচ্ছি না।"

মানসী বলিল, "তোমার মন যদি তোমায় না ব'লে দেয়, তবে তোমার জন্যে আমায় এমন কোনো পরম দুঃখ স্বীকার করতে দাও, এমন কিছু ত্যাগ করতে বল, যার জোরে তোমায় আমি জয় করে নিতে পারি। তখন আর তোমায় ভেবেচিন্তে আমার মন জোগাতে হবে না। তুমি ভাববার আগেই আমার মন খুশীতে ভরে উঠবে। সব যদি দখল করতে পারি, আড়াল থাকবে কি করে ?"

পরিমল বলিল, "জয় ত তুমি আমাকে করেছই, আমার বলবার ভাষা নেই তাই বলতে পারি না; আর দুঃখ পাই যে আমার মত অযোগ্যকে কেন তুমি এমন করে ভালবাসলে, কেন তার জন্যে পরম দুঃখও বরণ করতে চাও।"

মানসী বলিল, "জানি না কেন। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা করে নিজের মনকে এমনি করে কষ্টিপাথরে কষে নিই। আর তোমাকেও এমনি করেই কাছে টেনে নি। মনে হয় পৃথিবীতে দুটি দুঃখ ছাড়া

আর সব আমি তোমার জন্য সইতে পারি। পারিনে কেবল তোমার ভাগ ভূত-ভবিষ্যতে কাউকে দিতে, আর তোমার মধ্যে কোনো মিথ্যা দেখতে।"

পরিমল বলিল, "মানসী, ঠিক তোমারই মত আরও একটি মেয়েকে আমি চিন্‌তাম! সে তোমার মত সুন্দরী ছিল না, এত লেখাপড়াও শেখেনি, পাড়াগাঁয়ে গরিব বাপমায়ের পাঁচটা ছেলেমেয়ের মধ্যে মানুষ হয়েছিল। কিন্তু তোমারই মত করে ভালবাস্‌তে আর ভালবাসাতে সে চাইত, তোমারই মুখের কথার মত কথা যেন তোমারই গলার স্বরে তার মুখে শুনেছি।"

মানসী ম্লান করুণ মুখ পরিমলের মুখের দিকে তুলিয়া বিস্ফারিত চোখে তাহার দিকে তাকাইল। হাত দু-খানা তখন তাহার নিজের কোলের কাছে নামিয়া আসিয়াছে। একটুখানি কাঁপা গলায় দ্রুত তালে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে মেয়েটি? কি করে এত বেশী তাকে চিন্‌লে তুমি? সে কি তোমায় ভালবাস্‌ত?"

পরিমল চোখ নামাইয়া বলিল, "বেসেছিল একদিন।"

মানসী বলিল, "আর তুমি?"

"আমি! আমিও বেসেছিলাম বইকি!

"তবে তবে?"—মানসী আর কিছু বলিল না।

পরিমল বলিল, "সে আজ পৃথিবীতে নেই, মানসী।" মানসী কোমল কণ্ঠে বলিল, "এমন করে তুমি যদি তাকে না ভুলে যেতে তাহলে ভাল হ'ত না কি? অত বড় ভালবাসার এই কি প্রতিদান?"

পরিমল বলিল, "তা ত নয়ই। কিন্তু তার চেয়েও তোমার কাছে আমি বেশী অপরাধী, মানসী। তুমি পরম দুঃখ চেয়েছিলে। দুর্ভাগা আমি তোমাকে পরম দুঃখই দিলাম। কিন্তু এমন সে দুঃখ যা তুমিও

সইতে পারবে না বলেছ। তোমাকে আমার মিথ্যা রূপই আমি দেখিয়েছি, এতদিন তোমাকে ঠকিয়ে এসেছি। কিন্তু তোমার কলুষহীন অন্তরের কাছে মিথ্যা নিয়ে সহজ হ'তে পারতাম না বলেই আপনাকে ঢাকা দিতে আরও চেষ্টা করতাম। তোমার প্রেমের অন্তর্দৃষ্টিতে তাও ধরা পড়ে যেত। সেই আমার হারানো স্ত্রীর সাজানো সংসারে তোমাকে এনে বসাতেই তুমি যেন টের পেয়েছিলে এ পুরুষের হাতের কাজ নয়। তাই বার-বার তাকে আরও চাপা দিতে চেষ্টা করেছি।"

মানসী বলিল, "কেন তুমি এমন কাজ করলে ? ভগবান, আমার দেবতা যে ধুলায় লুটিয়ে গেল।"

পরিমল বলিল, "না হলে যে তোমাকে নিশ্চয় পেতাম না, এই জেনেই লোভে পড়ে অপরাধ করেছি। এ অপরাধের কি ক্ষমা নেই, মানসী ?"

মানসী বলিল, "জানি না, জানি না। যাকে পূজা করতে চেয়েছিলাম তাকে ক্ষমা করে আমার মনটা বেঁচে থাক্‌বে না, এইটুকু শুধু জানি।"

জীবে দয়া

আমরা বাঙ্গালীরা কয় পুরুষ ধরিয়া ইতিহাসের পাতায় যুদ্ধ কথাটা পড়িয়া আসিতেছি। পরীক্ষার সময় আমাদের পানিপথের যুদ্ধ ও পলাশীর যুদ্ধের তারিখ মুখস্থ করিতে হয়, অহঙ্কার করিবার সময় হলদীঘাটার যুদ্ধের স্মরণ লই। কিন্তু আমাদের এই রক্তমাংসের শরীর ঘেঁসিয়া যে যুদ্ধ দানবের লেলিহান জিহবা অগ্রসর হইয়া আসিতে পারে একথা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। ভাবিতাম যদি বর্ত্তমান জগতে যুদ্ধ নিতান্তই হয়, তাহা হইলে তাহা রুষে জাপে হইবে, না হয় জার্ম্মানি ও ইংলণ্ডে বাধিবে। আমরা বড়জোর সকালবেলা চায়ের পেয়ালার চেয়ে খবরের কাগজটার প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দিব এবং যুধ্যমান জাতি গুলির কোনও একটার পক্ষ লইয়া অপরটির সপিণ্ডকরণ করিব। কিন্তু হায় রে অদৃষ্ট ! সমর দেবতার রথচক্র এবার জল স্থল ও অন্তরীক্ষের বাধা মানিলনা, রণোদ্ধত ও রণভীতের ভেদাভেদ মানিলনা। সে এবার মেদিনী প্রদক্ষিণ করিবেং, দাবানলে ও বাড়বানলে সৃষ্টি ছারখার করিয়া দিয়া যাইবে।

১৯৪১এর ডিসেম্বর মাসের সকালে ড্রেসিং গাউন পরিয়া চায়ের টেবিলে বসিয়া ধূর্জ্জটিবাবুর প্রথম কাজ ছিল বাংলা ও ইংরাজী দুখানা খবরের কাগজই একত্রে করায়ত্ত করা। বিশ্ববার্ত্তার কোনও কণা তাঁহার আগে টেবিলস্থ আর কাহাকেও পরিবেশন করা হইবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কাগজগুলা পড়িয়া তিনি রায় দিবার পর অন্যের তাহাতে হাত দিবার অধিকার হইত। খবরের কাগজে চোখ বুলাইয়া লইয়া তিনি প্রত্যহ সকালেই বলিতেন, "ইংরেজের সঙ্গে

জাপান লড়্‌বে, হুঁঃ, তা আর হ'তে হয়না। এ চীনে পাওনি, বাবা; ভয়েই শেষ পর্য্যন্ত একটা মিটমাট করে ফেলবে।"

কিন্তু ৮ই ডিসেম্বর ধূর্জ্জটিবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ হইয়া গেল। জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। সারা কলিকাতায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে যত জাপানী ছিল ছোট বড় স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সবাইকে ধরিয়া জেলে পোরা হইতেছে। এ একটা নূতন রকম হুজুক, দুই-এক দিন শুনিতে ও দেখিতে মন্দ লাগে না। ঘরে ঘরে বালির বস্তা সাজান আর দরজায় দরজায় পাঁচিলের পর্দ্দা তোলা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কলিকাতায় এবং সহরতলীতে পোড়ো জমি আর রাখিবার জো নাই, সর্ব্বত্র আঁকা বাঁকা ট্রেঞ্চ কাটাইয়া সহরের যত কণ্ট্রাক্টার রাতারাতি লক্ষপতি হইবার চেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে। কাঁচের জানালার গায়ে কাগজ আর কাপড় আঁটা এবং বিজলি বাতির মুখে মুখে ঘোমটা টানা পর্য্যন্তও এমন কিছু মারাত্মক নয়। কিন্তু ঘরে ঘরে গৃহস্থের বুক কাঁপিয়া উঠিল সেদিন যেদিন শোনা গেল রণোন্মত্ত জাপানীদের পুষ্পক'রথ রেঙ্গুনে যে আগুনের ফুল বর্ষণ করিয়া গিয়াছে তাহাতে ৬০০ মানুষ এক নিমেষে বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছে। তবে তো কলিকাতার ভাগ্য পরীক্ষা হইতে আর দেরী নাই! কচি কচি ছেলেমেয়েগুলো শেষে কি এই দানবলীলার ইন্ধন হইয়া প্রাণ দিবে? বাঁচিয়াও যদি থাকে হয় ত একটার পা থাকিবে না, আর একটার হাত কাটা যাইবে, অথবা চোখ কাণের উপরেও এই শয়তানের নজর লাগিতে পারে। বোমার আওয়াজে ছেলে-পিলে নাকি হাবা বোবা হইয়া যায়। বাপ-মায়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—ভগবান, রক্ষার উপায় বলিয়া দাও। রেঙ্গুন হইতে কত বিচিত্র সত্য মিথ্যা খবর কলিকাতার বুকে প্রত্যহ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। জাপানীদের আকাশ যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণে

কাহার কাহার কাঠের বাড়ী ভস্মে পরিণত হইয়াছে, প্রাণভয়ে পথে ছুটিতে ছুটিতে পলাতক কত মানুষ পথেই জীবলীলা শেষ করিয়াছে! রক্তস্রোত ও মৃতস্তূপের উপর দিয়া ধাবমান কোন কোন মানুষ বিধাতার কৃপায় কৃতান্তের করাল গ্রাস হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

খবরের কাগজকে বহুগুণে ছাড়াইয়া মানুষের উন্মত্ত রসনা ঘরে ঘরে বিভীষিকা বিতরণ সুরু করিল। আজ রেঙ্গুন ধ্বংস হইল, কাল কলিকাতার পালা। মাড়বাড়ের মরুভূমি হইতে আসিয়া বংলার উর্ব্বর ভূমিতে যাহারা লক্ষপতি হইয়াছিল সকলের আগে শিহরণ দেখা দিল তাহাদের অন্তরে। যাহার যত সোনা দানা ছিল ষ্টীল ট্রাঙ্ক ও হোণ্ডঅলে পুরিয়া ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্স, ও গরুর গাড়ী চড়িয়া সকলে যাত্রা করিল হাওড়া ষ্টেশনের দিকে। কুম্ভমেলায় প্রয়াগের জনারণ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই কল্পনা করিতে পারিবেন সেই সময়ের হাওড়া ব্রীজ ও ষ্টেশনের দৃশ্য।

কিন্তু অবাঙালীদের পলায়নেই ব্যাপারটায় ছেদ পড়িল না। সুরু হইল বাঙালীদের পালা। কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান বাঁকুড়া, মধুপুর, দেওঘর যাহার কল্পনায় যে নামটি বড় হইয়া ফুটিল সে সেই দিকেই ছুটিল। যাহার অতদূর ছুটিবার ক্ষমতা নাই সে মনে করিল সহরের সীমানা ছাড়াইয়া বারো চৌদ্দ মাইল দূরে শৃগাল অধ্যুষিত কোন বাঁশবনে আশ্রয় লইলেই জাপানী উল্কাপাতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। সহরের দোতলা বাড়ী কলের জল, ট্রামগাড়ী, বিজলী বাতি, রেডিও, attached bathroom এর মোহ ধোঁওয়ার মত মন হইতে মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। হাওড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদা ষ্টেশনও জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। বাঙালীদের সংসারের মোহ অবাঙালীদের চেয়ে বেশী, তার উপর তাহাদের আজন্মের ভিটা এই দেশেই, সুতরাং স্থাবর জঙ্গম সমস্ত

সম্পত্তিই তাহাদের এইখানে। সর্ব্বস্ব ফেলিয়া যাইতে প্রাণ চায়না। কাজেই মানুষের চেয়ে তাহাদের লট বহরের গাদাই হইয়া উঠিল বড়। প্রতি মানুষের পিছনেই চলিয়াছে বিরাট এক একটি গন্ধমাদন পর্ব্বত। তাহাতে না আছে কি ? বাক্স বিছানার উপরে মাথা উঁচু করিয়া আছে চেয়ার, টেবিল, আলনা, সেলাইয়ের কল, গ্রামোফোন, খাটের বাজু মিটসেফ, ড্রেসিং-টেবিল ইত্যাদি। যাহারা নিতান্ত কমে সারিতে চায় তাহারাও লইয়াছে দেয়াল আলনা, তোলা উনুন, লণ্ঠন, ডেক চেয়ার, মোড়া, বালতি, টর্চ্চ।

ধূর্জ্জটিবাবু আপিসে যান আর শুনিয়া আসেন আজ কেষ্টধন পরিবার পাঠাইলেন বর্দ্ধমানে, কাল রামতারণ পাঠাইলেন মধুপুরে। ভদ্রলোক মরিয়া হইয়া বলিলেন, "গিন্নি, আর নয়। আমি তোমাদের প্রাণের দায়িত্ব নিতে পারব না, আসচে সপ্তাহেই যেতে হবে যেখানে হোক সেখানে।"

গিন্নি বলিলেন, "আমি বাপু, একলা এতগুলো ছানা পোনা নিয়ে চোরের হাতে মরতে পারবনা। এর চেয়ে বোমা ঢের ভাল। মরি মরব, সবাই একসঙ্গে মরব। কেউ কারুর জন্যে কাঁদতে বসে থাকবে না।" কর্ত্তা বলিলেন, "বলা ত খুব সোজা, কিন্তু ওই তোমার তিনটে ছেলে আর চার বছরের মেয়েটা চোখের সামনে হাত পা ছিঁড়ে ছত্রিশ টুক্‌রো হয়ে মরলে সহ্য করতে পারবে ?"

গিন্নি শিহরিয়া উঠিলেন, "বালাই ষাট। তোমরা মুখে কিছু বাধেনা। ভগবান কি আর কোথাও নেই যে সবার আগে বোমা এসে আমার বাছাদের মাথাতেই পড়বে ?"

ধূর্জ্জটি চটিয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্ আর ভগবান দেখাতে হবে না। যাদের কচি কচি ছেলে গুলো জাহাজশুদ্ধ ডুবে একসঙ্গে এক

হাজার মরে গেল তারাও ভগবানকে ডেকেছিল। বাড়ী চাপা পড়ে ইস্কুল ভর্ত্তি ছেলেমেয়ে গুঁড়ো হয়ে গেল, তাও ভগবান দেখেছিলেন। তুমি এত বেশী পুণ্যি কর নি যে তোমার ছেলেদের ভগবান ডানা দিয়ে আগলে রাখবেন?”

গৃহিণী কি আর করেন? ৩০৲ টাকা ভাড়ায় আসানসোলের নিকটস্থ একটি ষ্টেশনের একটা গলিতে একতলা দুখানা ঘর ভাড়া করার পরামর্শে বাধ্য হইয়া সায় দিলেন। শুনিলেন সরকারী গলির সঙ্গে সে ঘরের মেঝে উচ্চতায় সমান, স্নানের ঘর বলিয়া কোন পদার্থ বড়ীতে নাই, সনাতন মতে কূয়াতলাতেই জল তুলিয়া স্নান করিতে হয় এবং দুখানি ঘরের মধ্যে একখানির মাত্র পাকা ছাত, অন্যখানির টিনের চালা। গৃহিণীর পায়ের তলা হইতে মার্ব্বেলের মেঝে যেন সরিয়া যাইতে লাগিল, কংক্রিটের শিলিং হইতে দোদুল্যমান বিজলি পাখা যেন শূন্যে মিলাইয়া গেল। তিনি আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বহুদিনের অব্যবহৃত ষ্টীল ট্রাঙ্ক এবং চামড়ার স্যুটকেসগুলি মাচা হইতে নামাইবার আয়োজনে লাগিয়া গেলেন। বাড়ীতে মাত্র ছয়টা বাক্স পাওয়া গেল তাহাতে এই বিশ্বসংসার ধরে কি করিয়া? মাথা কয়টা বাঁচাইবার জন্য যখন ঘর ছাড়িয়া যাইতেই হইবে তখন সারাজীবনের সঞ্চয় গহনা কাপড়গুলি ত আর জাপানীদের বোমায় ভস্ম হইবার জন্য ফেলিয়া যাওয়া যায় না! ধূর্জ্জটি বলিলেন, “গয়নার বাক্সর জন্যে অত ভাবতে হবে না, ওত কাল ব্যাঙ্কে রেখে দিতে পারব। তাদের মাটির তলায় ঘর আছে। তোমার অন্য হাবজি গাবজি-গুলোর ব্যবস্থা কর। তোমাদের মেয়ে জাতের প্রাণের চেয়ে শাড়ীর মূল্য বেশী।”

শুধু শাড়ীই হইল তিন ট্রাঙ্ক। তার উপর রূপার বাসন, শাল, দোশালা, গরম কাপড় এ সবেও ছোট দুই বাক্স ভর্ত্তি হইবে।

সবাই বলে, তেল, সাবান, ছুঁচ, সুতো, ওষুধ, বিস্কুট, লংক্লথ, মার্কিন এসব আর পাওয়া যাইবে না। কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া যদি না রাখা যায় ত যুদ্ধের বৎসরগুলি ত বেনারসী শাড়ী আর শাল-দোশালাতেই কাটিবে না। বাজার উজাড় করিয়া লংক্লথ, মার্কিন, তোয়ালে, টমকোর তেল ও ৫০১নং সাবান, ছোট বড় টর্চ্চ, ছুঁচ, সুতো, খাতা, কালি, কলম, পেনসিল কত কি আসিল। আর তিন-চার মাসের মধ্যে বাজার হইতে সবই নাকি অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ভাবিলে আশ্চর্য্য লাগে যে চিনি আর নুনও নাকি আহার্য্য তালিকা হইতে শীঘ্রই বাদ পড়িয়া যাইবে এবং চালের দাম হইবে ৪০৲ টাকা মণ। গৃহিণী মহাশ্বেতা পেটমোটা মাটির কলসী ভর্ত্তি করিয়া করিয়া চিনি আর নুণ লইলেন যে কয়দিন ভাগ্যে আছে খাইবেন বলিয়া। ধূর্জ্জটি বলিলেন, "কয়লাও যে পাওয়া যাইবে না গো! এক ওয়াগন সঙ্গে নেবে নাকি?"

কর্ত্তা রসিকতা করিতেছেন কি সত্যই বলিতেছেন বুঝিতে না পারিয়া মহাশ্বেতা ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "রঙ্গ রাখ! মানুষ যাবার গাড়ী দেবে না শুনছি, কয়লা দিচ্ছে নিতে! তোমার ত রেল আপিসে অনেক বন্ধু আছে, বলে দেখ না! আমি না হয় বিছানার সঙ্গে বেঁধে দুই একমণ লুকিয়ে নিতে পারি, বেশী ত আর পারব না।"

ধূর্জ্জটি বলিলেন, "ঠাট্টাও বোঝ না গিন্নি! যা হোক তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বিদেশ বিভূঁই এর ব্যাপার কিছুই ত বলা যায় না! ধর যদিই কাঠ কয়লা না পাওয়া যায় দিন কতক! মণ খানেক গুঁজে টুঁজে নাও, আমি না হয় একটা কেরাসিন কাঠের বাক্স জোগাড় করে আনি।"

এক টিন শ্রী ঘি, দুই টিন সরিষার তেল, এমন কি একটা কেরা-সিনের টিন আর দশ সের আলুও সঙ্গে লওয়া ঠিক হইল। শিলনোড়া, বালতি, লণ্ঠন ও স্নানের ঘরের আসবাব প্রভৃতি অপরিহার্য্য সরঞ্জামে

মহাশ্বেতার মার্ব্বেলমণ্ডিত শয়ন কক্ষ বোঝাই হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ মহাশ্বেতা চক্ষু সজল করিয়া বলিলেন, "আপিসের নাম করে তুমি ত কলকাতার মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে থাকবে। তার পর, ভগবান না করুন, যদিই ধর বোমা টোমা পড়ে, রেল গাড়ীও বন্ধ হয়ে যায়, তখন ত তোমার একটা খবরও আর পাবার উপায় থাকবে না।"

ধূর্জ্জটি হাসিয়া বলিলেন, "তার জন্য ভাবছ কেন? ওই মনে করেই ত আসানসোল পাঠাচ্ছি, না হলে লক্ষ্ণৌ, আগ্রা কি আর পাঠাতে পারতাম না। আসানসোলে ট্রেণ থাক বা না থাক, পায়ে হেঁটেই গিয়ে হাজির হতে পারব, এতটা শক্তি এখনও আছে। তবে কি জান, কলকাতা থেকে যদি বেরোনো বারণ হয়ে যায় তা হলে অদৃষ্টে যাই থাক, আমাদের এখানে থাকতেই হবে। তেমন সম্ভাবনাও যে নেই তা নয়। সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া ভাল। তোমরা সেখানে ভাল থেকো, আমি না হয় টাইপিষ্টের সঙ্গে সহমরণে যাবো।"

বড় ছেলে রঞ্জন সবে মাত্র বাজার হইতে কয়েকটা হ্যাভারস্যাক কিনিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে পিছন হইতে বলিল, "আসানসোলেই যে বোমা পড়বে না এমন কথা কে বলল? মা, ব্লাউসে আর পেটিকোটে মজবুত রকম সব পকেট লাগাও, আর গেঁজের মত বেল্ট তৈরী করাও। যদি সেখান থেকেও বেরিয়ে পড়া দরকার হয়, টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি সব গেঁজেতে পুরে দৌড় দিতে হবে। তোমার ত আবার জুতো পরলেই পায়ে ফোস্কা পড়ে, বাহারের চটি পরে রাস্তায় ছুটতে পারবে?"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "মাগো, এই মোটা শরীর নিয়ে রাস্তায় দৌড়ব? গয়না-গাঁটি বেচেও কোনরকমে একটা অন্তত গরুর গাড়ী তোদের, আমার জন্যে জোগাড় করে দিতে হবে। তুই এত বড়

ছেলে, তোর ওটুকু যোগ্যতাও নেই ?" রঞ্জন বলিল, "হ্যাঁঃ, প্যানিকের সময় আমি গয়না বেচতে যাই আর কি ! সবাই তখন তোমার জন্যে দোকান সাজিয়ে বসে থাকবে কিনা ? যে পারবে গলাটি টিপে কেড়ে নেবে, গাড়ী চড়বার সখ জন্মের মত মিটে যাবে।"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, কপালে রাস্তায় দৌড়ানোই থাকে যদি চটি জোড়াও ফেলে না হয় খালি পায়েই যাবো। বেশীদূর আমায় যেতে হবে না, শীতে পথেই নিউমোনিয়া হয়ে কাজ হালকা হয়ে যাবে।" জিনিষ-পত্র ত গোছান হইল। কিন্তু ষ্টেশনে যাইবার নামেই মহাশ্বেতার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। রঞ্জন রাস্তার গুজব সংগ্রহ করিতে অদ্বিতীয়। কাল ভীড়ে কাহার ছেলে গাড়ীর চাকার তলায় পড়িয়া গিয়াছে, আজ কাহার হাত-খানা টানাটানিতে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কাহার কন্যাকে গুণ্ডায় ট্যাক্সিতে তুলিয়া পলায়ন করিয়াছে শুনিতে শুনিতে মহাশ্বেতার আহার নিদ্রা ঘুচিয়া গেল।

ভোর হইলেই ধূর্জ্জটি বলেন "আজ তোমাদের জন্যে ট্যাক্সি বায়না করতে বেরোতে হবে, সকাল সকাল চা দিও।"

মহাশ্বেতা চাবি হারাইয়া উনান নিবাইয়া কোন রকমে দেরী করিয়া দেন, ভীড়ের দিন কটা মিথ্যা ওজর করিয়া যদি কাটাইয়া দেওয়া যায় ত তিনি বাঁচেন। কিন্তু উনুন নেবানো, চাবি হারান, পেট ব্যথা, মাথা ধরার ছল-ছুতা আর কত দিন চলে ? আজ আঠার বৎসর ধরিয়া এই ঘর-সংসার তিনি তিল তিল করিয়া গড়িয়াছেন, জীবনের কত সুখও আনন্দের স্মৃতি ইহার ধূলিকণারও সহিত জড়িত। ইহার নিকট হইতে এই বিদায় হয়ত শেষ বিদায়। বিবাহের পর শ্যামবাজারে ভাড়াটে বাড়ীতে মহাশ্বেতা উঠিয়াছিলেন। তাহার সিঁড়ির তলায় রান্নাঘর, টিনঘেরা কলতলা, সদর দরজার সামনেই পায়খানা, পাঁচ ভাড়াটের পানের পিক

ও আবর্জ্জনায় সুচিত্রিত উঠান এবং পঙ্কিল নর্দ্দমা তাঁহার সৌখিন ও মার্জ্জিত মনকে পীড়া দিত। ধূর্জ্জটির বেতন বৃদ্ধির পর যখন এই বাড়ীর প্ল্যান করা হয় তখন মহাশ্বেতা বলিয়াছিলেন, "বাঙালীর বাড়ীতে রান্নাঘর স্নানের ঘর, উঠান কতটা সুন্দর করা যায় আমি দেখাব।" আজ তাঁহার রান্নাঘরের গ্যাসের উনান, স্নানের ঘরের আয়না আর বিজলি পাখা, উঠানের মার্বেবিলের সিঁড়ির পাশে রঙীন টবে পাতবাহারের গাছগুলি, বাগানের পথে ঢালা সাদা নুড়িগুলি, দোতলার বারান্দায় ঝুলান অর্কিড ফুল সকলেই যেন করুণ চোখে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিতেছে, "আমাদের ফেলে কোথায় যাও? তোমার মমতা মাখা হাতের স্পর্শে যে আমরা প্রতিদিন হেসে উঠতাম। সে আদর আর কি আমাদের ভাগ্যে কোন দিন হবে?"

শয়নকক্ষে তাঁহার পিতার তৈলচিত্রটির দিকে আজ চোখ তুলিয়া চাওয়া যায় না। ছবিতে পাছে দাগ পড়ে এই ভয়ে নিজের পরিহিত ফরাসডাঙ্গার শাড়ীর আঁচল দিয়া তিনি এই ছবিখানি মুছিতেন। আজ সেখানে মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিতেই মনে হইল পিতার চির বিদায়ের কথা ভুলিয়াছিলাম এই মুখের দিকে চাহিয়াই। কোন্ দানবলীলায় এমুখের চিহ্ন মুছিয়া যাইবে কে জানে? মূল্য দিয়া ইহাকে ত কোথা হইতেও ফিরিয়া আনিতে পারিব না। মায়ের ত ছবি নাই। মা নিজের গয়ার পাথরের কালো বাসনগুলি মেয়েকে দিয়া গিয়াছেন, ইহার মূল্য তুচ্ছ, কিন্তু কন্যা তাহাকে অমূল্য মনে করিয়া রাখিবে আশা করিয়াছিলেন। পূজার ঘরের ঐ পাথরগুলি, সাধারণ পিতলের ঐ ঘড়াটি, মার বড় আদরের ছিল। পাছে তাহাতে কলঙ্কের দাগ পড়ে বলিয়া, তেঁতুল দিয়া নিজে মহাশ্বেতা সেটিকে মাজিতেন! ইহাদের ছাড়িয়া যাইতে পা কি করিয়া উঠিবে? শকুন্তলা কণ্ব মুনির আশ্রম

ছাড়িয়া যাইতে এত বেদনা কি পাইয়াছিলেন ? মনে হয় না। কিন্তু সে ছিল আশ্রম, হরিণশিশু, বনতোষিণী, আর এ অতি আধুনিক সহুরে সংসার ? তাই মহাশ্বেতার দুঃখ কবির কাব্যে কোনদিন স্থান পাইবে না বটে, তবে মহাশ্বেতার এ বেদনা বাস্তবিক তাহার চেয়েও বড় । শকুন্তলা যাহাদের রাখিয়া গিয়াছেন তাহাদের আর কোনও একদিন আসিয়া দেখিবার ক্ষীণ আশা অন্ততঃ তাঁহার মনে ছিল। যদি না দেখিতেন, তবু ও মনে আশা ছিল, ইহারা অন্তত ওই স্নিগ্ধ শান্তির আবেষ্টনে নির্ব্বিঘ্নে দিনগুলি কাটাইয়া যাইবে । কিন্তু মহাশ্বেতার মনে কি সে আশা আছে ? এ সংসারে সবই ক্ষণভঙ্গুর বটে, তবু আমার জীবনে যা গড়িয়াছি পুত্রকন্যার হাতে সেই স্মৃতিজড়িত নীড়টি তুলিয়া দিয়া যাইব, অন্তত তাহাদের জীবন কালটুকুও তাহারা ইহার মধ্যে আমাদের স্মরণ করিবে, ইহাও ত মরণকে কিছু পিছাইয়া রাখা ! মহাশ্বেতার সে আশা কই ? যে গৃহ একদিন সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া মনে কত আশা জাগাইয়াছিল হয়ত কালই তাহা মায়া-মরীচিকার মত ধূলিতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশাইয়া যাইবে.। সন্তান-সন্ততিকে পথে দাঁড় করাইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইবে ।

প্রায় মাসখানেক ইতস্ততঃ করিয়া জানুয়ারী মাসের গোড়াতে মাহশ্বেতা চারিটি পুত্র-কন্যাকে লইয়া একদিন শুভ যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে বার পাঁচেক দিন বদল করিয়া অবশেষে আজ রবিবার দেখিয়া, ধূর্জ্জটি রাত থাকিতে উঠিয়া গোটা দুই ট্যাক্সি জোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। চাকরদের সঙ্গে কিছু জিনিষ বাসেও যাইবে।

এখন আর পথে তেমন মারাত্মক ভীড় নাই। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গোরার সঙ্গলাভে কাহারও আগ্রহ ছিল না বলিয়া কষ্ট করিয়া ইণ্টার ক্লাশে যাওয়াই মহাশ্বেতা ঠিক করিয়াছিলেন।

আসানসোলের কাছেই ছোট ষ্টেশনটি। প্ল্যাটফরম এত নীচু যে ট্রেণ হইতে নামিতে মই লাগাইবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে গরজ কর্ত্তৃপক্ষের কাহারও নাই। ইণ্টার ক্লাশের যাত্রীকে বসিতে দিয়াই রেল কোম্পানী কৃতার্থ করিয়াছেন মনে করেন। নামাইবার ব্যবস্থা করিবার কোন আলাদা পয়সা ত তাঁহারা লন নাই, তবে সে সব চিন্তায় মাথা ঘামাইবেন কেন?

ষ্টেশন ছোট হইলেও যাত্রী কিন্তু কম নামিল না। ষ্টেশনের বাহিরে একখানা মাত্র ট্যাক্সি এবং পাঁচছয়টি জীর্ণপঞ্জর রিক্স যাত্রী লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এক ভদ্রলোক অষ্ট অলঙ্কার পরিহিতা গুটি পাঁচেক মেয়েকে লইয়া প্রায় দৌড়াইয়া ট্যাক্সিখানা দখল করিয়া লইলেন। পশ্চাতে ধাবমান আর এক বাঙ্গালীকে ট্যাক্সিচালক হাত নাড়িয়া কি যেন বলিয়া গেল বোঝা গেল না। মহাশ্বেতা সদল বলে ষ্টেশনের গেট পার হইতেই দেখিলেন জোড়া জোড়া আরোহী এবং তাহাদের পায়ের উপর তিন চারিটি বাক্স ও বিছানা লইয়া দুই তিনটি সাইকেলরিক্সও অদৃশ্য হইয়া গেল। রঞ্জন পিছনের রিক্সগুলিকে গিয়া ধরিল। চালকেরা বলিল, "বাবু, বায়না করা আছে। এই খেপটা দিয়ে আসি তার পর আপনাদের নেবো।"

উপায় নাই! পথের ধারে অশ্বত্থ তলে জিনিষ-পত্রের স্তূপের উপর বসিয়া বিশ্রাম করার ভাণ করিতে হইবে। অদূরে একটি চায়ের দোকান একমাসেই গজাইয়া উঠিয়াছে, দেখা গেল। টিনের চালের তলায় কেরোসিন কাঠের বাক্স ও গোটা কয়েক ভাঙ্গা মোড়া পাতিয়া সকালে, দুপুরে, বিকালে চা বিলি হয়। খরিদ্দার দেখিয়া একটা বুড়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। মহাশ্বেতা বলিলেন, "হ্যাঁ বাছা, তেজেন বাবুর বাড়ী কত দূর বলতে পার?"

চাওয়ালা বলিল, "তেজেনবাবু ? তেজুগোয়ালার বাড়ী কোশ খানেক দূর হবে। হ্যাঁ মা, কলকাতার বাবুরা ত সব পালিয়ে আইছেন দেখছি, জাপানীরা কি হাওড়ার পোল অবধি এসে পড়েছে ?" মহাশ্বেতা বলিলেন, "আজ না আসুক, দুচারদিন পরেই আসবে, বাছা।" রিক্সওয়ালা ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত মহাশ্বেতাকে জাপানীদের অজেয় পরাক্রম সম্বন্ধে চাওয়ালার বক্তৃতা শুনিতে হইল।

ঘণ্টা খানিক পরে তিনচার খানি রিক্স জুটিল। লটবহর তাহাতে তুলিয়া সকলে রওনা হইলেন। গ্রাম্য রাস্তা ক্রমাগত লরি চলিয়া চলিয়া প্রায় আগাগোড়াই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার ঝাঁকানিতে মানুষের হাড়-গোড়েরও কব্জা খুলিয়া যাইবার জোগাড়।

রাস্তার দুই ধারে বাবলা বনের মধ্যে অতি সাধারণ একখানি গ্রাম, মাটির ঘরে খড়ের চাল। দরজা একটা করিয়া আছে, তবে জানালার বালাই নাই। পাশে পাশে দুই একখানা পাকা ঘর। অধিবাসিনীদের পরণে ঢাকাই শাড়ী ও সোনার গহনা; প্রায় সকলেরই পায়ে জুতা। প্রতি দরজায় এত মানুষ দাঁড়াইয়াছে যে, মনে হয় যেন রথযাত্রা কি ঠাকুর ভাসানের মিছিল দেখিতে সহর ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়াছে। পলাতকারা পরস্পর পরস্পরের দুর্গতি দেখিয়াই যেন কিছু সান্ত্বনা পাইতেছেন।

মাইল দুই পরে একটি কলাবাগানের মধ্যে তেজু গোয়ালার বাড়ী। একপাশে গোবরগাদা ও অন্যদিকে ছাই ফেলা আঁস্তাকুড়। টিনের চাল দেওয়া গুদাম ঘরের মত কুব্জপৃষ্ঠ একখানি ঘর, মাঝখানে উঠান, ওপারে কুঁয়াতলার পাশে পাকা ছাদ দেওয়া ছোট একটি রান্নাঘর। মাস কয়েক আগে টিনের ঘরখানি এক কয়লাওয়ালা ভাড়া লইয়া কয়লার দোকান করিত। মাসে ভাড়া ছিল ৫৲ টাকা।

পাকা রান্নাঘরখানিতে ছিল তেজু গোয়ালার খোল-ভূষি এবং

তাহার নিজের পান, আহার ও নিদ্রার ব্যবস্থা। দুধে জল মিশাইয়া ৫৲ টাকার দুধ সে কখনও ৩০৲ টাকায় বিক্রয় করিতে পারে নাই। আজ যুদ্ধ দানবের কৃপায় সে সুযোগ আসিতে দেখিয়া সে কয়লা-ওয়ালাকে পনের দিনের নোটিশ দিয়া এবং তালার উপর তালা লাগাইয়া তাহাকে তুলিয়া দিয়াছে। নিজেও জমিদার বাড়ীর দরোয়ানের দেউড়ীর ঘরে একটা আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়াছে। জমিদার বাবুর সাহায্যেই সে ধূর্জ্জটির নিকট একসঙ্গে তিনমাসের অগ্রিম ভাড়া নব্বই টাকা লইয়া কিছু সোনা কিনিয়া রাখিয়া দিয়াছে। কি জানি ইংরাজ সরকারের রাজ্য যদি না টেঁকে, সোনাটুকু অন্তত থাকিবে।

রিক্সওয়ালারা ভাড়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি জিনিষ-পত্র নামাইয়া দিল। সন্ধ্যা হ'ব হ'ব। তেজেনের গোময় পর্ব্বত ঘিরিয়া মশক গুঞ্জন সুরু হইয়াছে। উঠানের রন্ধনকক্ষের সদ্য ধরানো চুল্লীর ধূম দরজার ফাঁক দিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। কুব্জপৃষ্ঠ টিনের ঘরে একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল। মহাশ্বেতা বলিলেন, "মানুষটার দয়ামায়া আছে। উনুন ধরিয়ে আলো জ্বেলে ব্যবস্থা করে রেখেছে।" রঞ্জন দরজাটা ঠেলিয়া খুলিতে গেল! ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। সে বলিল, "মশাই, দরজায় খিল দিয়ে বসে আছেন কেন? আমরা কি বাড়ী ঢুক্‌ব না?"

ভিতর থেকে কে যেন কাংস্যকণ্ঠে বলিল, "মর্ ছোঁড়া, মস্করা করবার আর জায়গা পাস নি?"

রঞ্জন দরজায় সজোরে ধাক্কা দিয়া বলিল, "তেজেনবাবু কোথায়?"

থেলো হুঁকা হাতে করিয়া গুম্ফ-শোভিত এক ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "তেজু কোথায় দুধের জোগান দিয়ে বেড়াচ্ছে তা আমি কি জানি?"

রঞ্জন ও মহাশ্বেতা সমস্বরে বলিলেন, "তা জানবার দরকার নেই। আমরা শ্রান্ত হয়ে এসেছি। আমাদের ঘরে ঢুকতে দিন।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "এখানে কেন? আমার বাড়ীতে ত আর জায়গা নেই। আগে থেকে বাড়ী ঠিক করে আসতে হয়।"

মহা-শ্বেতা বলিলেন, "তিনমাসের আগাম ভাড়া দিয়ে বাড়ী নিয়ে রেখেছি, আবার কি রকম করে বাড়ী ঠিক করব? আপনাকে এ বাড়ীতে কে রেখেছে?"

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন, "কে আবার রাখবে? চল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়ে তেজুর কাছ থেকে বাড়ী নিয়েছি।" মহাশ্বেতা বলিলেন, "যার কাছ থেকেই নিন, আমরা এই বারান্দায় বসলুম, আপনি তেজেনকে ডেকে আনুন গিয়ে।"

পাঁচ ছয় হাত লম্বা সরু বারান্দায় পর্ব্বত প্রমাণ জিনিষ রাখিয়া মহাশ্বেতা একটা বাক্সের উপর বসিয়া পড়িলেন। চার বছরের খুকী বেণু বলিল, "মা, ঘুম পেয়েছে, বাড়ী চল।"

ভিতর হইতে কাংসকণ্ঠি বলিলেন, "যাও না গা, তেজুকে ডেকে এনে একটা হেস্তনেস্ত কর। এখনও ইংরেজ রাজত্ব রসাতলে যায়নি। যার খুসি এসে বাড়ি চড়াও হবে, আর মুখ বুজে তাই সইতে হ'বে?"

* * *

তেজেন্দ্রকে খুঁজিয়া আনিতে ঘণ্টা দুই লাগিল। তিনি আসিয়া করজোড়ে বলিলেন "দেখুন, ভদ্রলোক বাড়ীর অভাবে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। কচি কচি ছেলে নিয়ে দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। বাড়ীটা খালি

পড়েছিল, আপনারা পাঁচবার টেলিগ্রাম করেও এলেন না। তাই আমি দিনকতক এদের থাকতে দিয়েছি। এতদিন পরে যদি এলেন ত আর একটা টেলিগ্রাম করেও ত জানাতে পারতেন।”

মহাশ্বেতা বলিলেন, “করা ত হয়েছে পরশু।”

তেজেন বলিলেন, “পোষ্ট অফিস মাইল দুই দূরে, তাতে আবার আজ রবিবার। কাল সকালে হয়ত টেলিগ্রাম দিয়ে যাবে।”

ছুটি

কাল গৌরীর ছুটি। কথাটা ভাবিতেও তাহার ভরসা হয় না। মেয়েমানুষের আবার ছুটি! সে-সব বিয়ের মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে। মা থাকিতে তবু যাহা হউক মাঝে মাঝে তাহাকে টানিয়া-টুনিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া বাপের বাড়ী লইয়া যাইতেন, দুই চার দিনের জন্য হাতের সাঁড়াশি খুন্তি ছাড়িয়া ঝাঁটা ন্যাতার ভাবনা ভুলিয়া সে পাড়ার মেয়েদের গহনা, কাপড় ও দেমাকের গল্প করিয়া মুখটা বদলাইয়া লইত। কিন্তু পোড়া অদৃষ্টে সে সুখ কয়দিনই বা সহিল? বিবাহের পর দুই বৎসর না-যাইতেই মা স্বামী-পুত্রের কোলে মাথা রাখিয়া মেয়েটাকে চিরকালের মত সংসারের আগুনে দগ্ধ হইতে ফেলিয়া দিয়া সতীলোকে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় নিজের সৌভাগ্যের কথাই বলিয়া গেলেন। মেয়েটার দুর্ভাগ্যের কথা একবার ভাবিলেন না।

তখন ত গৌরীর বয়স মাত্র ষোল বৎসর, আর আজ তাহার ত্রিশ বৎসর বয়স হইতে চলিল। এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে ছুটি কাহাকে বলে তাহা সে একদিনের জন্য পরখ করিয়া দেখে নাই। স্বামী সওদাগরি আপিসে কাজ করেন; রবিবারটা তাঁহার ছুটি। কিন্তু গৌরীর সেদিন দু-গুণ কাজ। হপ্তায় ছয়দিন স্বামী শুধু জ্বলন্ত ভাত ডাল ও মাছভাজা খাইয়া আপিস যান, সন্ধ্যায়ও ভাল বাজার করা থাকে না বলিয়া ঝোলটা চচ্চড়িটার উপর আর কিছু হয় না। তাই রবিবার সকাল না হইতেই তেলধুতি পরিয়া গামছা-হাতে তিনি আপনি বাজারে বাহির হইয়া যান। গলদা চিংড়ি, গঙ্গার ইলিশ, দিশী কই, ট্যাংরা, ভেটকি, যখনকার যা মনের মত মাছ কিনিয়া আনেন। আবার রাত্রের জন্য একসের পাঁঠার মাংসও আসে। তরিতরকারির কথা ত না বলাই ভাল। কিবা তাহার এত দাম? কাজেই বাজারে যা চোখে ভাল লাগে তাহাই তিনি তুলিয়া আনেন। এই সৃষ্টির রান্না দুইবেলা বসিয়া বসিয়া করা কি আর কম কথা? সাহায্য করিবার মধ্যে ত ওই চার ট্যকা মাহিনার ঠিকা-ঝিটা! ঘস্‌ঘস্ করিয়া আধবাঁটা খানিকটা মসলা পাথরের রেকাবিতে তুলিয়া দিয়া আর দুম্‌দুম্ করিয়া দুই ঘড়া জল মেঝেয় বসাইয়া দিয়া সে খালাস। একটা মাছ কুটিয়া দিতে বলিলে বলিবে, "আজ বাপু, সব বাড়িতেই রোববারের হ্যাঙ্গাম, আমার অবসর কোথায়?" সে ত বলিবেই, মাহিনা-করা ঝি, কেনা বাঁদী ত আর নয়! পরের জন্য ভাবিতে যাইবে কেন? তুমি মর না তোমার হেঁসেলের ভিতর পচিয়া, তাহার কি গরজ পড়িয়াছে তোমার পিছনে ঘুরিতে?

মেয়েটা দশ বছরের হইয়াছে, কাজকর্ম্ম করাইলেই কিছু কিছু করিতে পারিত; তা গৌরীর একটু সুখ যাহাতে হয়, সংসারের

কাহারও কি তাহাতে সহে ? অমনি চোখ টাটাইতে থাকে। বাপ-কাকাতে পরামর্শ করিয়া বিবি মেয়েকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করা হইল—পড়িয়া মেয়ে টোল খুলিবেন কি না ? মাষ্টারণীরা রবিবারে যত অঙ্ক আর লেখার গাদা করিতে হুকুম করিয়া দেন, মেয়ে সারাদিনই খাতাকলম লইয়া তাই করিতেছেন। শ্বশুরবাড়ি হইলে খাতা কলম সবই ত উনুনে ফেলিয়া দিতে হইবে, তবু সে কথা বাবু সাহেবদের সামনে উচ্চারণ করবার জো নাই। যাক, তাহারা যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই করিবে। মা ত ছেলেমেয়েদের কেহই নয়, কেবল দশ মাস গর্ভে ধরিতে আর বুকের দুধ দিয়া মানুষ করিতে তাহার প্রয়োজন। ভাত কাপড়ের টাকা দিবার ক্ষমতা যখন তাহার নাই, তখন ছেলেপিলের ভাল মন্দের কথা বলিবার তাহার কিসের অধিকার ? মুখ বুজিয়া খাটিয়া মরিবার জন্য স্ত্রীলোকের জন্ম, যত দিন হাত-পা আছে খাটিয়াই মরিতে হইবে।

আপনার মনে সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে গৌরী আপনিই রাগিয়া উঠিতেছিল। বারমাস ত্রিশদিন এমনি করিয়া ঘরের কোণে সংসারের ঘানিতে চোখ বাঁধিয়া ঘুরিয়াই তাহার কাটে, তবু ইহাকে নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে সে পারে না। কেহ তাহার আপত্তি ও অসন্তোষের কথা কাণে তুলুক বা নাই তুলুক, যাহা বলিবার সে চিরকালই বলিয়া আসিতেছে।

এই যে এতবড় কলিকাতা শহর, ইহারই বুকে সে জন্মিয়া ত্রিশটা বৎসর কাটাইল ; কিন্তু বলিলে কেহ কি বিশ্বাস করিবে যে কলিকাতার কিছুই সে দেখে নাই ? লোকের মুখে শুনিয়াছে বটে যে এখানে চিড়িয়া-খানা, যাদুঘর, পরেশনাথ, শিবপুরের বাগান, গড়ের মাঠ আর আরও কত কি আছে। কিন্তু নিজের এই পোড়া চক্ষু দুটি দিয়া সে কিছুই

দেখে নাই। মা থাকিতে একবার কালিঘাটে দর্শন করিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু লোকের ভীড়ে ঠেলাঠেলিতে ভয়ে সে কিছুই দেখিতে পায় নাই। মাঝে হইতে কে একটা অসভ্য লোক তাহার হাত ধরিয়া টানিয়াছিল, শ্বশুরবাড়িতে জানাজানি হইবার ভয়ে মা পিসিমা লোকটাকে একটা উঁচু গলাতে কথাও বলিলেন না। বাড়ী আসিতে বাবা রাগিয়া বলিলেন, "ইহজন্মে আর মেয়েকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাব না কোথাও।" সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু বাস্তবিকই তাহার পর জীবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কুটুম বাড়ীতে ছাড়া সে আর কোথাও যায় নাই।

যাহা না দেখিয়াছে তাহার জন্য তাহার খুব দুঃখ নাই, কিন্তু যাহা অহরহই দেখে অথচ কাছ হইতে ভাল করিয়া দেখিতে পায় না তাহার জন্য প্রায়ই আপশোষ হয়। ওই যে বাতাসের মুখে হাউইএর মত জোরে মোটর-গাড়ীগুলা বাঁশী বাজাইয়া ছুটিয়া যায়, গহনা-কাপড়-পরা মেয়েরা তাহার ভিতর হাসিয়া কথা বলিতেছে, এক মুহূর্ত্তের মত আবছায়া একটুখানি চোখে পড়ে, ওই গাড়ীগুলিতে চড়িতে গৌরীর বড় ইচ্ছা করে। স্বামীকে কতদিন সে একথা বলিয়াছেও, "হ্যাঁগা, খুব কি পয়সা লাগে ওই গাড়ীতে চড়তে? আমায় বড় সাধ যায় একবার অমনি গাড়ীতে হুস করে সারা শহরটা বেড়িয়ে আসি।" স্বামী বলেন, "পয়সা ত লাগেই; যাদের পয়সা আছে তারা কি আর ভাড়া ক'রে চড়ে? গাড়ী কিনেই চড়ে। ভাড়া মোটরে যাদের দেখ, তারা ভদ্রমেয়ে নয়।" কিন্তু কথাটা তাহার বিশ্বাস হয় না। পাড়াপড়শীদের মুখে কি আর কোনও কথাই সে শুনিতে পায় না? এইত সে দিনই চন্দ্রা বলিতেছিল, বড়লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ থাকিলে তাহারা মোটরে ছাড়া কখনও যায় না। স্বামী যদি পয়সা খরচ করিতে না চান, না করিবেন।

কিন্তু ছাদে উঠিলে বড় রাস্তায় ওই যে ট্রাম গাড়ীগুলি যাইতে দেখা যায়, উহাতে ও নিত্য লোক পাঁচবার চড়িতেছে। চার পাঁচটা পয়সা খরচ করিলেই চড়া হয়। চন্দ্রা, বিধুর মা, রাণীদিদি সবাই ত ট্রামে চড়িয়া কত জায়গায় গিয়াছে। কিন্তু গৌরীর স্বামীর সবই অনাসৃষ্টি কাণ্ড। বলিলেই বলিবে, হ্যাঁ, আর মেমসাহেবী করে পুরুষের গা ঘেঁসে ট্রামে বসতে হবে না। তারপর কোনদিন ত ঘাঘরা পরে নাচতে চাইবে ?

ছিরির কথা শুনলে হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায়। বিশ্বসংসারে এত মেয়ে ট্রামে চড়িতেছে, কর্ত্তার নিজেরই ত মাসতুতো বোনেরা রোজ ট্রামে চড়িয়া পুরুষের কলেজে পড়িতে যাইতেছে, তাহারা যেন সবাই নাচিবার ঘাঘরা ফরমাস দিয়া আসিয়াছে। আর নাচের কথাই যদি বল, তাইবা আজকাল বাদ যাইতেছে কোথায় ? গৌরীরই না হয় তের-বৎসর বয়সে মাথায় ঘোমটা তুলিয়া ঘরে শিকল দেওয়া হইয়াছিল ; এখনকার সব কুড়ি বছরের বুড়ীরা ত শুনি নাচ দেখাইয়া বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করিতেছে। বরেদের ত তাহাই পছন্দ। কটা মেয়ের জাত গেল তাহাতে ? অদৃষ্ট বলিয়া একটি জিনিষ নিশ্চয় আছে। না হইলে গৌরীর বা তের বৎসরে বিবাহ হইল কেন, আর ইহাদেরই বা কুড়ি বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত এত আনন্দে অবাধ স্বাধীনতার ভিতর দিন কাটিতেছে কেন ?

বড় একটা বারকোষে করিয়া ময়দা মাখিতে মাখিতে ও লেচি কাটিতে কাটিতে গৌরীর মাথার ভিতর দিয়া এত চিন্তা জলস্রোতের মত বহিয়া যাইতেছিল। বাবুরা দুই ভাই ও ছেলেমেয়েরা রোজই রাত্রে রুটি খান, তাছাড়া কাল সারাদিনের ছুটি পাইতে হইলে আজ হইতেই বাড়ি সুদ্ধ লোকের সারাদিনের রসদ জোগাইয়া রাখিতে হইবে,

এত জানা কথা। গৌরী ঠিক করিয়াছে সের দেড়েক ময়দার লুচি নরম করিয়া ভাজিয়া ও এক খোরা আলুর দম রাঁধিয়া ধামা ও শিল চাপা দিয়া রাখিয়া যাইবে, তাহাতেই কালকের দুটো বেলা চলিয়া যাইবে। বুড়ী শাশুড়ীর জন্যই যা ভাবনা, একে দাঁত নাই, তাহাতে চোখ দুটি প্রায় অন্ধ; বাসি লুচিও চিবাইতে পারিবেন না, নিজেও হাত-পা নাড়িয়া কিছু করিয়া লইতে পারিবেন না। চারটিখানি চিঁড়া ভিজাইয়া রাখিয়া গেলে হয়। খোকাকে আজ বার পাঁচেক মুখস্থ করাইয়া দিলে কাল সকালে হয়ত মনে করিয়া দোকান হইতে পোয়াখানেক দই আনিয়া দিতে পারে। অবশ্য যা গুষ্টির ছেলে, হুঁস বলিতে ইহাদের কোনও জিনিষ নাই। কাজেই বুড়ীকে না খাওয়াইয়া মারাও ইহাদের পক্ষে কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু কিইবা করা যায়? ত্রিশ বৎসর বয়সে একটি দিনের মাত্র ছুটি, তাহাও কি কেবল সংসারের চিন্তাতেই কাটিয়া যাইবে? এ যেন ঠিক ঢেঁকির স্বর্গে গমন।

কোলের এক বছরের মেয়েটা তরকারীর ঝুড়ির ভিতর হাত পুরিয়া খেলা করিতেছিল। হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার করিয়া গৌরীকে চমকাইয়া দিল। ময়দা মাখা হাতে মেয়েকে তুলিয়া গৌরী দেখিল একটা লাল টুকটুকে লঙ্কা হাতের মুঠায় ধরিয়া খুকী তাহাতে কামড় বসাইবার চেষ্টা করিয়াছে। ভাগ্যে চিবাইয়া ফেলে নাই, তাহা হইলে ত এখনই ঠোঁটও জিভ ফুলিয়া উঠিত, কাজকর্ম্মও ঘুচিয়া যাইত, বেড়াইতে যাইবার সখও মিটিয়া যাইত। এই মেয়েটাকে লইয়াই হইয়াছে সব চেয়ে বড় সমস্যা। এটাকে ফেলিয়া যাইবে, কি লইয়া যাইবে, স্থির করা শক্ত। মেয়ে অর্দ্ধেক খান বোতলের দুধ, আর অর্দ্ধেক মায়ের দুধ। একটা দিন ঢোকাদুধ খাওয়াইয়া বাড়িতে রাখিয়া যে যাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু যা ছিনে জোঁকের মত দুধ টানা অভ্যাস, একদিন না পাইলে ক্ষুধায় না-

হউক রাগেই চিলের মত চেঁচাইয়া মরিবে। ফিরিয়া আসিলে বুড়ী শাশুড়ী তখন গৌরীকে গাল দিয়া আর আস্ত রাখিবেন না।

এক কাজ করিলে হয়; রাণী-দিদির মেয়ে ত ছ-মাসের, দুধে তাহার এখনও যেন বান ডাকিয়া যায়। সে কি আর ইচ্ছা করিলে একটা দিন গৌরীর মেয়েকে দুধ দিতে পারে না? কিন্তু দুধ দেওয়ার চেয়ে বড় হ্যাঙ্গাম যে সারাদিন ঐ পেত্নী মেয়ের ঝক্কি পোহান। রাণী দিদি সৌখীন মানুষ, সে কি আর এত ঝঞ্ঝাট সহিতে রাজি হইবে? নিজের ছেলেদেরই বলে তাহার দুইটা ঝি। হ্যাঁ ভাল কথা, ঝিগুলোকে আনা-চারেক পয়সা দিয়া মেয়েটাকে গছাইয়া দিলে হয় না? কিন্তু তাহাতেও মুস্কিল আছে। বড়লোকের বাড়ী যে সারাদিন থাকিবে, এত জামা-কাপড়, তোয়ালে তাহার মেয়ের কোথায়? বাড়ীতে ত সে সারাদিন উলঙ্গই পড়িয়া থাকে। ওখানে অমন ভাবে দিলে ত ঝিয়েরাও বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলে ছুঁইবে না। দেখা যাউক মেজ খুকীর বয়স পাঁচ বৎসর হইলেও তাহার দুই-চারখানা জামা কাপড় খুকীটা সেদিনকার মত পরিতে পারে কি না! না হইলে এত কাজের ভিতর এক দিনে কাপড় সেলাই করা কিংবা পয়সা খরচ করিয়া কিনিয়া আনা ত আর সম্ভব নয়!

একটা গোলাপী ফ্রক আগাগোড়া ধূলায় ধূসর করিয়া ডান হাত খানা মুখের ভিতর পুরিয়া চুষিতে চুষিতে মেজ খুকী লাবু মাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গৌরী একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়া বলিল, "হ্যাঁরে লাবি, বুড়ো হতে চল্‌লি, এখনও আঙুল চোষা রোগ গেল না?" লাবি বলিল, "দাদা ল্যাবেনচুষ দিয়েছিল তাই খাচ্ছি, আঙুল ত চুষিনি।" তার পরই সে অন্য কথা পাড়িল, "মা, কাল তুই কোথায় যাবি, আমায় নিয়ে যাবি নে?"

গৌরী বলিল, "হ্যাঁ, তোমাদের ল্যাজে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্যেই আমি এত খাটছি আর কি ? ঘরে ত অষ্ট প্রহরই হাড় জ্বালাতে আছ, আবার পথেও তোমাদের নিয়ে গেলেই হয়েছে।"

লাবি গাল ফুলাইয়া বলিল, "কেন হবে না ? আমি ত আর বের গি্য মেয়ে নয়, পথে বেরোলে আমার কি হবে ? দিদিকে ঘরে রেখে যেও, আমি যাবই।" গৌরী মুখনাড়া দিয়া বলিল, "একরত্তি মেয়ের কথার বাঁধন দেখ। ফের পাকামি করবি ত উনুন কাঁদায় মুখ ঘসে দেব একেবারে। যা বেরো এখান থেকে এখখুনি।"

লাবি বাহিরে যাইবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া মাটিতে পা ঘসিতে ঘসিতে নাকিসুরে "আমি যাঁব, আমি যাঁব" করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্নার শব্দ পাইয়া বড় খুকীও পুঁটি কোথা হইতে আঁচল লুটাইতে লুটাইতে ছুটিয়া আসিয়া হাজির। "কোথায় যাবে মা, ও কেন কাঁদছে ?" মা বলিল, "চুলোয় যাবার জন্যে কাঁদছে; তুমিও ধর না প্যাঁ এইবার, তবে ত চারপোয়া ভর্ত্তি হবে!"

পুঁটি খানিকক্ষণ মুখ গম্ভীর করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি বুঝি নেমন্তন্ন খেতে যাবে ? ওকে কেন নিয়ে যাবে না ? আমার ত দুখানা রাঙা শাড়ী আছে, একটা ওকে দেব, তাহলেই ত দুজনেরই যাওয়া হবে।"

গৌরী বলিল, "না গো না, দাতাকর্ণ, তোমায় শাড়ী দিতে হবে না, আমি নেমন্তন্নে যাচ্ছি না। তোমাকেও নিয়ে যাব না, আমি একাই যাব।"

পুঁটি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ছুটকীটাকেও নিয়ে যাবে না ? ও কার কাছে থাক্‌বে ?"

গৌরী রাগিয়া বলিল, "কার কাছে থাকবে তার আমি কি জানি ? একটা দিনের জন্যে বাইরে যাব তা এখন সুরু হল কৈফিয়ৎ দেওয়া সাত গুষ্টিকে। ডেকে নিয়ে আয় না মনা ধনা সবাইকে কার কি বলবার আছে বলে নিক্। এমন অদেষ্টও মানুষের হয়! সাতকুলে কেউ যদি আছে একটু সাহায্য করতে। কাল যদি আমি মরি, তাহলেও তোদের গলায় বেঁধে মরতে হবে, না ?"

পুঁটি মাতার এমন আক্রোশের কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া একেবারে চুপ হইয়া গেল। গৌরী ছোট মেয়েটাকে মেঝে হইতে তুলিয়া পুঁটির কোলে চাপাইয়া দিয়া বলিল, "যা দিখি যা, এটাকে নিয়ে একটু বাইরের রোয়াকে বস্‌গে যা। আমার ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে এখনও। এই সব লুচি-তরকারি হলে পর মা'র কাপড় তুলে, কত্তার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাণীদির বাড়ী যেতে হবে মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করতে। সন্ধ্যে ত হয়ে গেল, কখন যে কি করব ভেবেই পাচ্ছি না। এদিকে ভোর না হতে দুধ জ্বাল দিয়ে ছুট্‌কীকে একবার গিলিয়ে যেতে হবে। তারা ত ৭॥টাতেই এসে পড়বে নিতে।"

পুঁটি বাহিরে যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া পড়িয়া আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কারা মা, কারা ?" গৌরী হঠাৎ সদয় হইয়া বলিল, "ঐযে রে, কত্তার বন্ধু তিনকড়ি বাবু, তাঁরই মা আর বোন। দেশ থেকে এসেছে অর্দ্ধোদয় যোগে চান করতে। কাল সকালে চান করে সারাদিন শহর দেখবে, আমিও যাব সেই সঙ্গে।" লাবি ও পুঁটি সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "মা, আঁমরাও যাব তোর সঙ্গে।"

গৌরী বলিল, "কোথায় যাবি বাছা, পরের সঙ্গে ? তাদের গাড়ীতে অনেক লোক থাকবে, আমি অমনি কোনো রকমে তার মধ্যে ঝুলে টুলে চলে যাব। ছেলেপিলে কি আর সঙ্গে নেওয়া চলে ?"

লাবির কান্না থামিল না। পুঁটি চোখটা মুছিয়া লইয়া বলিল, "আমার জন্যে তাহলে গঙ্গার ঘাট থেকে একটা বৌ-পুতুল এনো।" লাবি কাঁদিয়া কাঁদিয়াই বলিল, "আমারও।"

কাজকর্ম্ম সারা হইলে গৌরী রাণীর বাড়ী গিয়া দেখিল, সেখানেও যোগে স্নানের পরামর্শ চলিতেছে। গৌরীকে দেখিয়া রাণী বলিল, "কি ভাই, যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে? তুমি ত সাতজন্মে কোথাও যাও না, এই সুযোগে একটু ঘর থেকে বেরোনোও হবে, পুণ্যি করাও হবে। আমরা ট্রামে যাব দল বেঁধে, ট্রাম চড়ার সখটাও ওই সঙ্গে মিটিয়ে নিতে পারবে।"

গৌরী একটু দুঃখের সহিত গর্ব্বের সুর মিলাইয়া বলিল "না ভাই, তোমাদের সঙ্গে ট্রামে যাওয়া আর ঘট্‌ল না। উনি ওঁর বন্ধুর মোটরে যাবার ব্যবস্থা করেছেন।"

রাণী বলিল, "তবে ত তোমার পোয়া বার, আর গরিবের সঙ্গে ট্রামে যাবে কেন?"

গৌরী বলিল, "গরিব যে কে, তা ত ভাল করেই জান। তবে আর ঠাট্টা করছ কেন? সঙ্গে যাই আর নাই যাই, আমি এলাম তোমারই একটু দয়া ভিক্ষা করতে। বলতে সাহস হয় না, কি জানি কি ভাব্‌বে তুমি।"

রাণী বলিল, "নির্ভয়েই কও, অত ভেবে কি হবে?"

গৌরী বলিল, "আমি ত কলকাতা শহরের কিছুই দেখিনি, ওই সঙ্গে কাল সব দেখে আস্‌ব। তিনকড়ি বাবুর মা বোনেরা চানের পর সারাদিনই বেড়াবে, শহরের এ-মোড় থেকে ও-মোড় কিছু আর বাকি রাখবে না। তা পরের সঙ্গে ছেলে পিলে নিয়ে যাওয়া ত আর চলে না, ওগুলোকে ঘরেই ফেলে যেতে হবে। শুধু ছুট্‌কীটার জন্যে ভাবনা।

তুমি যদি ওকে তোমার ঝিদের কাছে একটু রাখতে দাও, আর—আর—কি বলে—একটু দুধ—”

গৌরী বলিল, “বাপ্‌রে বাপ্, কি না কথা তার আবার এত আম্‌তা-আম্‌তা! থাকবে এখন ছুট্‌কী এখানে, তাতে কি পৃথিবী উল্‌টে যাবে?”

গৌরী সলজ্জভাবে বলিল, “না, ও এখনও মাই-দুধ ছাড়েনি কি না!”

রাণী হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা, আচ্ছা, তার জন্যে এত আকাশ পাতাল ভাবতে হবে না। তুমি লাবিটাকেও এইখানে রেখে যাও।”

মেয়েদের ব্যবস্থা ত হইল, এখন পুঁটি লক্ষ্মীছাড়ী না বিপদ বাধাইলেই হয়। যে-কথাটি যাহাকে বলা বারণ, সবার আগে তাহাকেই সেই কথা বলিয়া আসা মেয়ের রোগ। সাধে কি আর গৌরী মেয়েদের কাছ হইতে এতক্ষণ কথাটা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পুঁটি সাত-তাড়াতাড়ি ঠাকুরমার কাছে গৌরীর নামে লাগাইতে ছুটিবে। এই বেলা কিছু ঘুষ দিয়া উহার মুখবন্ধ না করিলে অর্দ্ধোদয় দেখা তাহার মাথায় উঠিয়া যাইবে। বৌমানুষের এই সব বেঁড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার চেষ্টা শাশুড়া দু-চক্ষে দেখিতে পারেন না। বুড়ী শাশুড়ী রহিল ঘরে পড়িয়া আর বৌ চলিলেন গঙ্গাস্নানের পুণ্য করিতে। ভাগ্যি চোখে তেমন দেখিতে পান না, তাই কোন প্রকারে লুকোচুরি করিয়া সারিবার আশা আছে। নহিলে এসব কল্পনা সে স্বপ্নেও করিত না। পুঁটিকে একমুঠা আমচুর ঘুষ দিয়া আজিকার মত চুপ করাইয়া রাখিতে পারিলে কাল যদি সে ঠাকুরমাকে বলিয়াও দেয় ত কিছু আসিয়া যায় না। ঘর হইতে একবার বাহির হইয়া পড়িলে বুড়ী যতই গাল দিক না গৌরীর ত আর গায়ে লাগিবে না। ফিরিয়া

আসিলে অবশ্য একপালা খুব চলিবে। তা' পেটে খাইতে পাইলে পিঠে অমন দুই-চারি ঘা সহিয়া যায়।

গৌরী ছেলে মেয়েদের ডাকিয়া সকাল-সকাল খাওয়াইয়া শুইতে বলিল। মনা ধনা বলিল, "কেন মা, এখুনি শোব কেন ? রোজ ত কত রাত ক'রে পড়াশুনা ক'রে তবে শুই!"

পুঁটি নাচিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি জানি, জানি।"

গৌরী তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "জান ত একেবারে রাজা ক'রে দিয়েছ আর কি ? চুপ ক'রে থাক্ এখন।" তারপর মণিকে ডাকিয়া আদর করিয়া বলিল, "তুমি বাবা লক্ষীটি, কাল সকালে ৯টার সময় ঠাকুমাকে এক-পো দই কিনে এনে দিও, এই তোমার কোঁচার খুঁটে আমি পয়সা বেঁধে দিলুম। কিছুতেই এ কথা যেন ভুলো না। সকালেই আমি গঙ্গা নাইতে চলে যাব, তুমি যদি না এনে দাও ত তাঁর সারাদিন খাওয়াই হবে না।"

মনা বলিল, "তুমি কি সারাদিনই গঙ্গা নাইবে নাকি ?"

হাসিয়া গৌরী বলিল, "সারাদিনই নাইব না। কিন্তু আমিও ত একটা মানুষ, আমারও ত একটা সখ-টক একটু আধটু হয়। কাল চানের পর আমি কলকাতার শহর দেখতে যাব। তোরা সব যাদুঘর, চিড়িয়াখানা কত কি বলিস, কাল আমি একেবারে সব শেষ করে দেখে আস্‌ব।" মনা বিজ্ঞের মত বলিল, "দেখতে ত যাচ্ছ, কিন্তু সেখানে সব তিমিমাছ, উটপাখী, সিন্ধুঘোটক কত কি আছে, তোমাকে বুঝিয়ে দেবে কে ? সব ইংরিজীতে লেখা, তুমি ত, এ বি সি ডি-ও জান না।"

গৌরী বলিল, "না জানি ত কি হয়েছে! যারা ইংরিজী জানে না তারা বুঝি আর চোখ তাকিয়ে দেখতেও জানে না!"

মনা বলিল, "চোখ তাকালেই যদি সব বোঝা যেত, তাহ'লে আর লোকে এত কষ্ট ক'রে দিনরাত পড়াশুনো করত না।"

আসরে গৌরীর স্বামী আসিয়া দেখা দিলেন। গৌরী তাড়াতাড়ি আসন পাতিয়া তাঁহাকে বসিতে দিয়া বলিল, "হ্যাঁগো, ভাল ক'রে ব'লে এসেছ ত? পথঘাট ঠিক ব'লে না দিলে তাদের গাড়ী আবার বাড়ী খুঁজে পাবে না। আমি এদিককার সব ব্যবস্থা সেরে রেখেছি, আমার জন্যে এক মিনিটও দেরী হবে না।"

কর্ত্তা শম্ভুনাথ আসনে বসিয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "বলেছি গো বলেছি, আমাকে আর শেখাতে হবে না। কিন্তু তোমাদের ছেড়ে দিতেই যে আমার ভরসা হচ্ছে না। আজ শুনে এলাম পাঁচলাখ লোক নাকি স্নান করতে এসেছে কলকাতায়। এই ভীড়ের মধ্যে তোমাদের ছেড়ে দিলে চাপা পড়েই ত মারা যাবে। এবারকার মত না হয় চানটা বন্ধ থাক, পরে আবার কখনও গেলেই হবে।"

গৌরী একেবারে ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, "হবে পরে। আমি যমের বাড়ি গেলে গঙ্গার ধারে ত নিয়ে যেতেই হবে। একসঙ্গে চিরকালের মত পুণ্যি হয়ে যাবে। এই মতলব যদি ছিল ত আগে বল্‌লেই হ'ত, সারাদিন ধ'রে সাত-শ রকম কাজে আমি খেটে মরতুম না। দণ্ডবৎ বাবা এই গুষ্টিকে, মানুষের একটা ভাল যদি সইতে পারে! ..."

গৌরীর সুর ক্রমেই চড়িতেছে দেখিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "যেও গো যেও, গাড়ীচাপা পড়তে যদি তোমার সখ থাকে আমি বারণ করব না। আমার জামা-কাপড়টা ঠিক করে রেখে যেও, তাহলেই হবে।"

গৌরী কথার উত্তর দিল না। কয়েক মিনিট উত্তেজিত ভাবে

এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করিয়া আবার স্বামীর সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "গাড়ীচাপা পড়ে মরলে আর আমার ক্ষতিটা এমন কি বেশী হবে? তোমার উনুন-কাঁদায় বসে ত চারবেলা রাজসেবা পাচ্ছি না। সে তবু বুঝব ধর্ম্ম করতে গিয়ে প্রাণটা গিয়েছে। সেকালে ত লোকে রথের চাকায় ইচ্ছে করেই প্রাণ দিত।"

শম্ভু চটিয়া বলিল, "তবে আর ঘটা করে বেড়াবার আয়োজন করা কেন? সকালে উঠে একটা গাড়ীর চাকাতেই মাথা পেতে দিও এখন। একেবারে বৈকুণ্ঠলাভ হয়ে যাবে। তার আগে আজকের মত আমার ভাতটা বেড়ে দাও।"

গৌরী রাগে গর-গর করিতে করিতে শম্ভুর ভাতের থালাটা আনিয়া দুম করিয়া তাহার সম্মুখে বসাইয়া দিল। রাগের মাথায় এক বাটি ডালই ভাতের উপর ঢালিয়া দিল। তারপর কাহারও কিছু প্রয়োজন আছে কিনা খোঁজ না করিয়াই আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

টিনের ট্রাঙ্ক ঘাঁটিয়া অনেক কষ্টে লাবির দুইটা ও ছুটকীর একটা পরিষ্কার ফ্রক বাহির হইল, তাহারও আবার সব কয়টাতে বোতাম নাই। ছেলেদের শার্টের বোতাম কাটিয়া গৌরী মেয়েদের জামায় লাগাইয়া দিল।

ছেলেরা নিজের ঘরে থাকিবে একদিন জামায় বোতাম না থাকিলে কিছু আসিয়া যায় না। পরের বাড়িতে যাহারা যাইবে, তাহাদের জামাগুলা আগে ঠিক্ হওয়া দরকার। পাজামা লাবির দুইটা আছে ছুটকীর একটাও নাই। সকাল বেলা এই দুইটাই দুইজনকে পরাইয়া দিবে, আর ধনার ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্টের পা দুইটা মুড়িয়া ছুটকীর জন্য একটা বাড়তি পাজামা বানাইয়া রাখিয়া গেলেই হইবে। কিন্তু বাড়িতে একটা কাঁচিও নাই যে পা দুইটা ঠিক করিয়া কাটিবে।

গৌরী হাফ-প্যাণ্টটা লইয়া বঁটিতে ঘসিয়া একটু কাটিয়া বাকিটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর পুরানো পাড় হইতে তোলা লাল সূতা দিয়া সেই দুইটাকে সেলাই করিয়া মেয়ের ভদ্র পরিচ্ছদের সমস্যা মিটাইল। তোয়ালে বলিয়া বাড়িতে কোন পদার্থ নাই, জোলার একখানা গামছা আছে, তাহাতেই বাড়িসুদ্ধর স্নান ও রবিবারের বাজার করার কাজ চলিয়া যায়। রাণীদিদির ছেলেরা আবার পরের গামছায় স্নান করে না। কাজেই বিছানার চাদরের ছেঁড়া টুকরাটা পাশ মুড়িয়া এই সঙ্গে দিয়া দিতে হইবে! বড় মানুষের বাড়িতে একবেলা থাকিতেও এক মাসের ব্যবস্থা দরকার। ভাগ্যে গৌরীর সাবান একখানা ছিল, না হইলে সাবান কিনিতে আবাব পয়সা বাহির করিতে হইত।

গৌরীর নিজের ব্যবস্থাও একটু করা দরকার। স্নানের গামছাখানা একদিনের মত সে-ই লইয়া যাইবে, ছেলেরা ঠাকুরপোর গামছায় একদিন মাথা মুছিয়া লইলে সে নিশ্চয় মারিতে আসিবে না। স্নানের পর পরিবার জন্য একখানা ভাল কাপড় ত চাই,—কত ভাল ভাল জায়গায় লোকজনের সঙ্গে ঘুরিতে হইবে ত! চৌদ্দ বৎসর আগে মা একখানা হাতী ও মাছ পাড়ের মাদ্রাজী শাড়ী দিয়াছিলেন, তাহার একদিকের পাড় বেগুনী, একদিক লাল। কাপড়খানা গৌরীর ভারী পছন্দ ছিল। কোথাও যাওয়া-আসা প্রায় নাই বলিয়া বেশী পরা হয় না। সেইখানাই গামছার মধ্যে জড়াইয়া লইয়া যাইবে, পাঁচজনের মধ্যে পরিবার মত শ্রী সেখানার এখনও আছে।

রাত্রে গৌরীর চোখে ঘুমই প্রায় আসিল না। যত বারই ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়ে, তত বারই চমকিয়া ঘুম ভাঙিয়া যায়, কখন বুঝি ভোর হইয়া যাইবে। ভোরবেলা গোয়ালার কাল আসিবার কথা, দুধ জ্বাল দিয়া একবার ছুটকীকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া যাইতে হইবে, তারপর

দুটো মেয়েকেই একটু মাজিয়া ঘসিয়া তবে ত রাণীদির বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে। শীতকালের বেলা, সাড়ে সাতটা না-বাজিতে গাড়ী আসিয়া পড়িবে।

সকালে সাতটার সময় গৌরী যখন মেয়েদের রাণীর বাড়ি দিয়া আসিল, তখনই তাহারা স্নানযাত্রার উদ্যোগ করিতেছে। তাঁহারা সকাল-সকাল স্নান করিয়াই ফিরিয়া আসিবে, বেশী ভীড়ের সময় থাকিবে না, বাড়িতে একেবারে কচি মেয়ে! তাহাদের বাড়িটা বড় রাস্তার প্রায় ধারেই, গৌরী বারাণ্ডা দিয়া দেখিল সারা কলিকাতার লোকই প্রায় ইতিমধ্যে পথে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। অনাবৃত দেহ পুরুষ ও মলিনবস্ত্রা নারীর ভীড়ে পথ ভরিয়া গিয়াছে। হারাইয়া যাইবার ভয়ে দূর গ্রামের মেয়েরা এখন হইতেই আঁচলে গিরো বাঁধিয়া চলিয়াছে। একটা ঘোড়ার গাড়ী দেখিলেই চাপা পড়িবার ভয়ে হাঁটুর কাপড় তুলিয়া দিগ্বিদিকে ছুটিতেছে। এক দল ছেলে লাল উর্দ্দি পরিয়া গলির মুখে মুখে ঘুরিতেছে দুই একটা লরিতে কাহারা যেন লুচি ও বোঁদে বোঝাই করিয়া লইয়া চলিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় মাড়োয়ারী। গৌরীর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিবার আর একটু ইচ্ছা ছিল কিন্তু কখন গাড়ী আসিয়া পড়িবে, আসল দেখাই হইবে না, এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি সে বাড়ি চলিয়া গেল।

গৌরীকে খিড়কির দরজার কাছে দেখিয়াই শম্ভু বলিল, "ও গো, আজকের রবিবারে ত আর বাজার করা নেই, তোমার ত আজ অরন্ধন। কাপড় জামাটা নিয়ে পথেই বেরোনো যাক্, ভীড় দেখাও হবে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে স্নানটাও হয়ে যাবে। তুমি ছেলেগুলোকে বলে দিও তুমি যাবার পর যেন বাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে রাখে। আজ খালি শহর পেয়ে চোর ছ্যাঁচড় অনেক এদিক ওদিক ঘুরবে।"

শম্ভু কাপড় লইয়া বাহির হইয়া গেল। গৌরী একবার ঘর ও একবার বাহির করিতে লাগিল। রান্নাঘরের উনানে আগুন নাই, মেঝেয় বসিয়া ছুট্‌কী কাঁদিতেছে না, লাবি তাহার পিছন পিছন আঁচল ধরিয়া ঘুরিতেছে না, দিনটা যেন কেমন কিম্ভূত কিমাকার ঠেকিতেছে। এমন একেবারে বিনা-কাজে মানুষ দিন কাটায় কি করিয়া? আধ ঘণ্টাতেই ত গৌরী হাঁপাইয়া উঠিতেছে। রাণীদি চন্দ্রারা ত বাড়ি নাই যে খানিকক্ষণ গল্প করিয়া আসিবে। ছাদে উঠিয়া ভীড় দেখিলেও চলিত, কিন্তু গাড়ী আসিয়া ফিরিয়া যাইবার ভয়ে সেখানেও যাওয়া চলিবে না। গাড়ীটা কোনো রকমে আসিয়া পড়িলে সব গোল চুকিয়া যায়। সাড়ে সাতটা কি আর বাজে নাই? তাহার কাছে ঘড়ি নাই বটে, কিন্তু রোদের রকম দেখিয়া ত আটটার কম মনে হইতেছে না।

খুট্‌ খুট্‌ করিয়া দরজায় কে যেন কড়া নাড়িতেছে, গাড়ীর চাকার ত কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না। মোটরগাড়ী কি এমনই নীরবে আসে নাকি? "পুঁটি দেখত রে দোরটা খুলে, কে কড়া নাড়ছে।"

পুঁটি দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিল অচেনা একজন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। পুঁটিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইটা কি শম্ভুনাথ বাবুর বাড়ী?"

পুঁটি বলিল, "হ্যাঁ।"

লোকটা ছোট্ট এক টুকরা কাগজ পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিল, "বাবুরা এই চিঠি দিয়েছেন।"

পুঁটি বলিল, "বাবা ত বাড়ী নেই, মা জবাব দিতে পারবে না।"

সে বলিল, "জবাবে দরকার নেই। তুমি ভিতরে দাও গিয়ে।" গৌরী মেয়েকে ডাকিয়া বলিল, "তুই পড়্‌না, কি লেখা আছে।"

পুঁটি বানান করিয়া পড়িল।

কাল রাত্রে দেশ হইতে আর দুইজন আত্মীয়া আসিয়া পড়াতে গাড়ীতে আর জায়গা নাই। আপনার স্ত্রীকে গঙ্গাস্নানে লইয়া যাইতে পারিলাম না বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি। ইতি—

শ্রীতিনকড়ি রায়।

গৌরীর আজ অখণ্ড ছুটি। স্নান করিবার কষ্টটুকুও স্বীকার করিতে হইল না।